সেলিম রেজা নিউটন

পশ্চিমা প্রচারণামাধ্যমে মুসলমানের মুখ

A Distinguished Lecture Series

Muslims in the West

Post 9/11: Challenges and Opportunities

with Ibrahim Ramey

Director of Human and Civil Rights Division, MAS Freedom, Washington D.C.
Former Vice President (and current at-large member) of the Steering Committee of the Religious NGO Community at the United Nations
Board Member, Interfaith Worker Justice, Chicago

Friday, April 1st | 7 P.M. to 8:30 P.M.
Hazel Kelley Wilson Alumni Banquet Hall

Sponsored by: Distinguished Lecture Series, WTAMU Diversity Committee
College of Education and Social Sciences, CORE

সেলিম রেজা নিউটন

পশ্চিমা প্রচারণামাধ্যমে মুসলমানের মুখ

শ্বেতাঙ্গ-খ্রিস্টান-সমাজে ‘সংখ্যালঘু’ অপর-এর সামাজিক পরিচয় তৈয়ার করার কায়দাকানুন

https://archive.fo/LR3QP

উদ্দেশ্য ও পদ্ধতি

পশ্চিমের শ্বেতাঙ্গ-খ্রিস্টান-সমাজের প্রচারণামাধ্যম যেভাবে বিধর্মী ‘সংখ্যা-লঘু’দের সামাজিক পরিচয় তৈয়ার করে থাকে তার কায়দাকানুনগুলো উদ্-ঘাটন করার চেষ্টা এই প্রবন্ধে আমি করেছি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের টুইন টাওয়ার ও পেন্টাগণে ‘অজানা’ ব্যক্তিবর্গের সন্ত্রাসী হামলার পরিপ্রেক্ষিতে আফগা-

নিস্তানে ইঙ্গ-মার্কিন-ইয়োরোপীয় আগ্রাসন এই প্রবন্ধের পটভূমি।

প্রবন্ধটা প্রণয়নে এই উপলব্ধি আমাকে প্ররোচিত করেছে যে, বাংলা-দেশে আদিবাসী, পাহাড়ী, হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান এবং গরিব মুসলমানসহ সকল নিপীড়িত মানুষের স্বাধীনতার সীমাকে প্রসারিত করার লড়াই করতে যেয়ে যে-প্রশ্নগুলো ওঠে সেইগুলোর সাথে বুদ্ধিবৃত্তিক বোঝাপড়া করার বেলায় আমরা যেন অতি-স্থানীয়তা-দোষে দুষ্ট না-হয়ে পড়ি, যেন বিশ্বের অন্যান্য অঞ্চলের পাশাপাশি পশ্চিমের রাষ্ট্র-পরিগঠনের ইতিহাসজাত অভি-জ্ঞতাকে আমাদের চিন্তা পরিষ্কার করার কাজে লাগাতে পারি সেই জন্যেও পশ্চিমের তথাকথিত ‘সংখ্যালঘু’ — তথা নিপীড়িত — জনগোষ্ঠীসমূহের প্রান্তিকীকরণ বা অপরায়ন-এর বিদ্যমান প্রক্রিয়াগুলোকে অধ্যয়ন করা দরকার।

পশ্চিমা সমাজে ‘সংখ্যালঘু’-নির্মাণের প্রক্রিয়াটাকে নিয়ে কথাবার্তা বলা এই জন্যেও গুরুত্বপূর্ণ যে, পশ্চিম আজকের দুনিয়ার ‘রাজধানী’ই শুধু নয়, ‘আধুনিকতা’ নামক ঐতিহাসিক-ঔপনিবেশিক বচনবাচন-ডিসকোসর্কে বিচার-বিবেচনা না-করেই উন্নতির পবিত্র ধারা হিসাবে গ্রহণ করার মাহাত্ম্যে পশ্চিমকে আমরা মানবজাতির সব চাইতে অগ্রসর সমাজ বলেও বিশ্বাস করে আসছি ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের যুগ থেকেই। শেষোক্ত এই কারণেও ইহা গুরুত্বের দাবিদার যে, মানবজাতির সবচে অগ্রসর বলে ‘বিশস্ত’ সমাজে ‘সংখ্যালঘু’ মানুষের হাল কী প্রকার। অর্থাৎ, গণতন্ত্র, মানবাধিকার ও তথা-কথিত ধর্মনিরপেক্ষতার চ্যাম্পিয়ন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, তথা পশ্চিমা দেশগুলো, তাদের নিজেদের ‘সংখ্যালঘু’ নাগরিকদের সাথে কেমন আচরণ করে, এবং কেনই বা তা করে, সেটা দেখাই এই প্রবন্ধের প্রধান মতলব। পরিষ্কার বাংলা ভাষায় বলে রাখতে চাই, ইসলাম ধর্ম বা তার অনুসারী মুসলমানদের সম্পর্কে কোনো বিশেষ অনুভূতি তৈরি করা কোনো ক্রমেই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য না।

অবশ্য, একদা-প্রাচ্যের, তথা বঙ্গের, মসলিন যেমন চিক্কন বলে কথিত হয় তেমনই মিহি কিন্তু তেমনই পরাস্বচ্ছ মিডিয়াপর্দা সরিয়ে এই প্রবন্ধে ঘোষিত লক্ষ্য হাসিল করার কাজটা কঠিন অতিশয়। আর, গ্রামে বসে যেহেতু সাম্রাজ্যবাদ বোঝা কঠিন সেই হেতু অসম এই সংগ্রাম বা অভিযানে দৃষ্টান্ত হিসাবে আমি নিয়েছি শুধু মুসলমান ‘সংখ্যালঘু’দের ব্যাপারটাকে। (অন্য

অন্য দৃষ্টান্তকে এই প্রবন্ধে দাওয়াত দিতে গেলে লেখকের অবস্থা যে বেহাল হয়ে পড়বে সেই কথা বলা সত্যি বাহুল্য।) আরো কিছু কারণ আছে। সাম্প্রতিক একটা কেস হিসেবে মুসলমানদের ব্যাপারটাকে নিলে বাংলাদেশের মানুষদের মগজে-আক্কেলে সহজেই প্রবেশ করতে পারার সম্ভাবনা থাকে। পরিণামে ইঙ্গ-মার্কিন-ইওরোপের 'আধুনিক' সমাজে আর-সমস্ত 'অনাধুনিক' 'সংখ্যালঘু'দের (যেমন এশীয়, কালো, আফ্রিকীয়, হিন্দু, ভারতীয়, পূর্ব ইওরোপীয়, আর নারীর কথা তো আছেই, এখানে আবার উঠবেও) সামাজিক পরিচয় তৈয়ার করার পদ্ধতিপ্রণালীগুলো বেশ খানিকটা হেফ্‌জো করার মওকা পাওয়া যাবে। বোঝা যাবে এই সত্য, পশ্চিমে শুধু মুসলমানরাই মিডিয়া-প্রচারণার শিকার নয়, অন্যরাও আছে। এছাড়া, মুসলামানদের ব্যাপারটাকে কেস হিসাবে নিলে বাংলাদেশের সংখ্যাগুরু মুসলমানদের মনের মধ্যে এ-দেশের হিন্দু-খ্রিস্টান-সাঁওতাল-চাকমাদের মনের ভেতরকার তথাকথিত 'সংখ্যালঘু-কমপ্লেক্সের' বেদনা সামান্য সঞ্চারিত করে দেয়ার কিসমতও আমাদের ঘটে।

সর্বোপরি, পশ্চিমা দুনিয়াতে বিধর্মী শত্রু 'সংখ্যালঘু' হিসাবে মুসলমানরাই এখন প্রচারণামাধ্যমের সবচে বড় টার্গেট। একটা তথ্য জানালেই সেটা টের পাওয়া যাবে। ডেনমার্কে গত বছরের ১৫ই মে থেকে ১৫ই আগস্ট পর্যন্ত ৩ মাসের ৬টা জাতীয় সংবাদপত্র এবং ২টা টিভি চ্যানেলের ওপর জরিপে দেখা গেছে, সেখানকার মিডিয়া-কাভারেজের ৭৫ শতাংশই ইসলাম সম্পর্কিত এবং তার মধ্যে ৬০ শতাংশই নেতিবাচক [Quraishy, 2001]। পশ্চিমের অন্যান্য দেশের পরিস্থিতি ডেনমার্কের চেয়ে খুব একটা কমবেশি না, খারাপই বরঞ্চ, আমরা তা দেখব। এইখানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন, কানাডা, ইতালি ও ডেনমার্কের 'সভ্য' রাষ্ট্রসমুচয়ের কতিপয় মামলা দৃষ্টান্ত হিসাবে কাজে খাটিয়েছি (তার চে বেশি আপাতত পারি নি)। সুতরাং এই প্রবন্ধের বিষয়বস্তু এই মুহূর্তে যে মুসলমানরাই হবে, সেটা স্বাভাবিক।

পশ্চিমা প্রচারণামাধ্যমের কর্মকাণ্ডসমূহকে নিয়মিতভাবে তদন্ত ও অধ্যয়ন করেন এবং এ-ব্যাপারে মানুষকে সচেতন করার কাজ করেন এমন নানান ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের পুস্ততক ও ওয়েবসাইট থেকে পাওয়া বিদ্যা এই প্রবন্ধের কাজে ব্যবহার করেছি বিচারমূলক পর্যালোচনার বিশ্লেষণ-পদ্ধতি কাজে

লাগিয়ে। ঐ বিদ্যা, সত্যি কথা বলতে গেলে, ইতোমধ্যে এতোটা বেশি পরিমাণে পাওয়া গেছে (যার অনেকটাই অবশ্য বিদ্যাজঞ্জাল) যে, সবটা কাজে লাগাতে পারি নি এই প্রবন্ধে। মিডিয়ার পঠনপাঠনের সাথে দীর্ঘ দিন ধরে সক্রিয়ভাবে যুক্ত একজন লোক হিসেবে এই প্রবন্ধের লেখকের নিজের পর্যবেক্ষণও এখানে ব্যবহৃত হয়েছে। এই পর্যবেক্ষণ যেমন পশ্চিমা প্রচারণা-মাধ্যমের গ্রাহক হিসাবে তেমনি বাংলাদেশ-রাষ্ট্রের নাগরিক হিসাবেও। অর্থাৎ, জায়গায় জায়গায়, বাংলাদেশের 'সংখ্যালঘু'দের প্রসঙ্গও পর্যবেক্ষণ-জনিত তুলনার আওতায় এসে পড়েছে প্রাসঙ্গিকতার স্বার্থে।

শ্রেণী-আধিপত্য, অপরায়ন এবং প্রচারণা-প্রকৌশল

'সংখ্যালঘু' সামাজিক পরিচয় নির্মাণের সময় পশ্চিমা শাসক শ্রেণীর মনে শ্রেণী-প্রশ্নটাই বড়ো হয়ে থাকে। পশ্চিমের সমাজ এবং বাকি দুনিয়াকে আধিপত্য করাই এই শ্রেণীর আসল লক্ষ্য। উদ্দেশ্য তাঁদের দুনিয়াজোড়া বৃহৎ পুঁজির ব্যবসাকে রক্ষা ও সম্প্রসারণ করা। অধিপতির চোখ দিয়ে সে তার নয়া অর্থনৈতিক উপনিবেশের লোকসমাজকে পশ্চিমের প্রাচ্যবাদী চোখ দিয়ে দেখা অব্যাহত রাখে। ফলে, 'সংখ্যালঘু'দের সামাজিক পরিচয় নির্মাণের বেলায় অধিপতি শ্রেণী তাদেরকে এমনভাবে পরিবেশন করে যেন তাদেরকে সুস্থ, স্বাভাবিক, সভ্য, আধুনিক, শিক্ষিত, সাধারণ মানুষ বলে কারো মনে না-হয়, কোনো-না-কোনোভাবে তাদেরকে যেন বিকৃত ও খাটো দেখায়।

একটা বিষয় লক্ষ করা জরুরী যে, সামাজিক-সাংস্কৃতিক অপরায়নের যে-প্রক্রিয়ার কথা এই প্রবন্ধে আলোচিত হচ্ছে তা কিন্তু সার্বক্ষণিকভাবে বড়লোক-গরিবের বেলায়ও জারি থাকে। বড়লোক শ্রেণীর জীবনাচরণ ও মতাদর্শই সমাজে 'আচরণীয়' 'গ্রহণযোগ্য' 'স্বাভাবিক' বলে বিবেচিত হয়, বাকিদের (যাদের মধ্যে সংখ্যার দিক দিয়ে গরিবরা সবচে বড়ো জনগোষ্ঠী) জীবনাচরণ ও মতাদর্শকে মনে করা হয় অনাচরণীয় অগ্রহণযোগ্য ও অস্বাভাবিক। পশ্চিমের বাইরের দুনিয়া ঐতিহাসিক ক্যারিকেচারে পড়ে গরিব থাকার কারণে সেই জগতের জীবনাচরণ ও মতাদর্শসমূহ হয়ে ওঠে 'অস্বাভাবিক'-'অপর'। কিন্তু, পশ্চিম-বহির্ভূত জগতেও বড়লোক আছে, গরিবও আছে। এখন, খেয়াল করলে দেখা যাবে সারা দুনিয়ার বড়লোকদের একই

চাল। এর একটা কারণ হলো, ব্যবহৃত সম্পদ, সুবিধাদি ও প্রযুক্তির দিক দিয়ে, অর্থাৎ কাঠামোগতভাবেই, সারা দুনিয়ার বড়লোকদের জীবন-যাপন-প্রণালী কমবেশি একইরকম। আরেকটা কারণ হলো, ঐ কাঠামোর সাথে আরও আরও ফ্যাণ্টাসি ও রঙ মাখিয়ে সেটাকে মানবজীবনের সর্ব-জনীন আদর্শ প্রণালী হিসাবে সারা দুনিয়ার মানুষের কাছে তুলে ধরার বিরতিহীন প্রবাহ-পদ্ধতি-প্রচারণা — এরই নাম মিডিয়া; এই জন্যেই তাকে প্রচারণা-মাধ্যম নামে ডাকা। (সারা দুনিয়ার সব দেশেরই বলতে গেলে অধিপতি শ্রেণীর অধিপতি মিডিয়ার এই একই হাল। বলা সম্ভবত বাহুল্যই যে, আন্তর্জাতিক মিডিয়া-সিস্টেম আসলে পশ্চিমা অধিপতি মিডিয়া-সিস্টেমের সম্প্রসারণমাত্র।) সুতরাং, পশ্চিমের যে-অপরায়নের কথা বলছি, নিশ্চয় বোঝা যাচ্ছে যে, অঙ্গাঙ্গিভাবেই তা সামগ্রিক প্রচারণাপ্রণালীর সাথে যুক্ত। অপরাপর মতাদর্শিক ব্যবস্থার পাশাপাশি (যেমন শিক্ষাব্যবস্থা) মূলত প্রচারণা-মাধ্যমই বলে দেয়, এবং ‘করে দেখায়’ কী ‘স্বাভাবিক’ আর কী নয়। এবারে আফগানিস্তানে মার্কিন যুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে অরুন্ধতি রায় যখন বলেন, “... যুক্তরাষ্ট্রকে প্রথমেই যা করতে হবে তা হলো মেনে নিতে হবে, পৃথিবীর অন্য দেশগুলোর মতোই তারাও একটি দেশ ... তাদের মতোই বাকি সবাই এ পৃথিবীরই মানুষ, এমনকি যদি তাদেরকে টিভিতে দেখানো নাও হয়...” [রায়, ২০০১] তখন তিনিও পশ্চিমা টেলিভিশন তথা প্রচারণা-মাধ্যমের এই সামাজিক-সাংস্কৃতিক অপরায়নের দিকেই ইঙ্গিত করেন। তো, এই ইলেক-ট্রনিক টেলিভিশন ও প্রিন্ট-টেলিভিশনে (পশ্চিমের এবং সেই আদলে গড়ে-ওঠা অপশ্চিমের প্রবল ধারার সংবাদপত্রকে ‘মুদ্রণ-টেলিভিশন’ বলা ছাড়া আর উপায় কী?) যা প্রচারিত হয় না তা, কখনো কখনো, ‘স্বাভাবিক’ তো দূরের কথা, এমন-কি ‘মানবীয়’ বলেও বিবেচিত হয় না। তাই যদি না-হতো, আফগানিস্তানের যুদ্ধপীড়িত, না-খেতে-পাওয়া, গরিব ও নিরীহ শত শত (কত শত কে জানে?) বেসামরিক মানুষের ওপর নির্বিচার বোমা হামলা করে দেশটাকে তামা-তামা করে ফেলার পক্ষে দুনিয়াজোড়া জনমত তুলতে পারা সম্ভব হলো কীভাবে, কোন জাদুর কাঠির ছোঁয়ায়? তা কি ঐ টেলিভিশন নামক ভীষণ জাদুর বাক্সর ভেল্কিই নয়, যার সাথে তাল-লয়ে সঙ্গত করল ঐ মুদ্রণ-টেলিভিশন?

পশ্চিমা প্রচারণামাধ্যম বলতে এই প্রবন্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও ইউরোপের ব্যবসায়ী-বড়লোক শাসকশ্রেণীর কর্পোরেট 'মিডিয়া' বা তথা-কথিত 'মিডিয়া'সমূহকে বোঝানো হয়েছে। সাধারণভাবে সর্বত্র-প্রায় এই 'বিশ্বাস' প্রচলিত যে, ইওরো-মার্কিন-উত্তর আমেরিকার দেশসমূহের রেডিও-টিভি-সংবাদপত্র অত্যন্ত স্বাধীন ও গণতান্ত্রিক; এবং সমাজের মানুষদের জন্য দরকারি 'তথ্য' সম্প্রচার বা লেনদেন করা এবং সরকারের ও সমাজের ওপর-তলার প্রেসারগ্রুপসমূহের নানারকম অপরাধ-দুর্নীতি ফাঁস করে দেয়ার মাধ্যমে জনগণকে সচেতন করা ও জনগণের স্বার্থ রক্ষা করা এদের কাজ। কিন্তু বাস্তবে তারা দেখে বড়লোকদের স্বার্থ, কেননা বড়লোকরাই ঐগুলোর মালিক এবং তাদের স্বার্থই 'জনগণের স্বার্থ' এবং উহাই স্বাভাবিক। কোটি কোটি ডলারের বিনিয়োগ ছাড়া যেখানে পত্রিকা-ব্যবসা চলে না সেখানে মালিকের স্বার্থের চেয়ে আর কার স্বার্থ বড় করে দেখা হবে? আবার, মালিকের আব্বা-হুজুরের নাম হলো বিজ্ঞাপনদাতা। মার্কিন পত্রিকা-গুলোর আয়ের শতকরা ৬৫ ভাগ আসে ওনাদের কাছ থেকে; কানাডার বেলায় এই হার ৭০ ভাগ; এবং বিজ্ঞাপনদাতারা পত্রিকাওয়ালাদের কী পরিমাণ টাকাপয়সা দেন তার একটা নমুনা দেয়া যেতে পারে: ১৯৯৯ সালে ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল-এর একটা পূর্ণ-পৃষ্ঠা-বিজ্ঞাপনের জন্য বিজ্ঞাপনদাতারা দিতেন ১,৫০,০০০ মার্কিন ডলার বা পৌনে এক কোটি টাকা প্রায় [মাইক্রোসফট এনকার্টা এনসাই-কোপিডিয়া ২০০২]। মাত্র একদিনে এক পাতায় এক কোটি টাকা! এর সাথে মনে রাখুন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পত্রিকাগুলো গড়ে মোটামুটি ৬৫ পৃষ্ঠার হয়ে থাকে। ছুটির দিনে এগুলো ২০০ পৃষ্ঠার ঢাউশ আকার ধারণ করে। একটা পত্রিকা ২০০ পৃষ্ঠার! অতো মোটা কি খবরের জন্য? অবশ্যই না—বিজ্ঞা-পনের জন্য। এই মালিক-বিজ্ঞাপনদাতা-বড়-লোকদের স্বার্থই পত্রিকার স্বার্থ। কিন্তু পশ্চিমা প্রচারণা-সিস্টেম এতো বেশি দক্ষ ও সূক্ষ্ম যে, সারা দুনিয়ার লোকে ঐ সিস্টেমটাকে অত্যন্ত স্বাধীন, গণতান্ত্রিক ও দায়িত্ববান 'তথ্য-ব্যবস্থা' বলে মনে করে এবং সেইটাকে গরিব দেশগুলোর জন্য নকলযোগ্য মডেল বলেও ভাবেন। অনেকেই লক্ষ করেন না যে, পশ্চিমের বড়লোকেরা তাদের নিজেদের মতো করে নিজেদের সুবিধা অনুযায়ী যে-সাংবাদিকতা-শাস্ত্র গড়ে তুলেছেন সেইটাই পবিত্রতার সাথে পড়ানো হয়ে সাংবাদিকতা/

গণযোগাযোগ-বিভাগগুলোতে। শাস্ত্রের মূল্যবোধগুলোকে এসব বিভাগের শিক্ষকগণ স্থান-কাল-পাত্র-নির্বিশেষে ইতিহাসের ধ্রুব সত্য বলে গণ্য করেন। মার্কিন এই মিডিয়ার প্রচারণার স্বরূপ দেখিয়েছেন এডওয়ার্ড এস. হারম্যান ও নোম চমস্কি:

> সাধারণ জনগোষ্ঠীর কাছে বার্তা ও প্রতীকসমূহ কম্যুনিকেট করার একটি সিস্টেম হিসেবে ম্যাস-মিডিয়া কাজ করে থাকে। তাদের কাজ হলো মানুষকে আমোদ-প্রমোদ-বিনোদন দেয়া, তথ্যজ্ঞাপন করা, এবং তাদের মনের মধ্যে এমনসব মূল্যবোধ, বিশ্বাস, ও আচরণবিধি প্রোথিত করে দেয়া যা তাদেরকে বৃহত্তর সমাজের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর সমগ্রতার মধ্যে সমন্বিত করে। যে-জগতে সম্পদ কেন্দ্রীভ,ত এবং যে-জগত শ্রেণীস্বার্থের সংঘাতে আকীর্ণ সেই জগতে মিডিয়ার ঐ ভ,মিকা পালন করতে গেলে সিস্টেমেটিক প্রচারণা প্রয়োজন হয়।
>
> যেসব দেশে ক্ষমতার হাতলগুলো রাষ্ট্রীয় আমলাতন্ত্রের হাতে সেসব দেশে মিডিয়ার ওপর একচেটিয়া ধরনের নিয়ন্ত্রণ (প্রায়শ সরকারী সেন্সর -শিপসহ) এই সত্যকে স্পষ্ট করে তোলে যে, মিডিয়া আধিপত্যশীল এলিটদের হয়ে কাজ করছে। কিন্তু যেখানে মিডিয়া ব্যক্তিমালিকের খাতে থাকে এবং সরকারী সেন্সরশিপ যেখানে অনুপস্থিত সেখানে যে-প্রচারণা-সিস্টেম ক্রিয়াশীল থাকে তাকে দেখতে পাওয়া অনেক বেশি দুরূহ। মিডিয়া যেখানে সক্রিয়ভাবে প্রতিযোগিতা করে, এবং কর্পোরেশান ও সরকারের দুষ্কর্ম ফাঁস করে দেয়, এবং সাধারণ মানুষের স্বার্থের মুখপত্র হিসেবে নিজেদেরকে সাংঘাতিকভাবে তুলে ধরে সেখানে ঐ দুরূহতা আরও বিশেষভাবে সত্য হয়ে ওঠে। [Herman and Chomsky, 1994: 1] (অনুবাদ আমার — স.র.ন.)

পশ্চিমে সরকার ও মিডিয়ার সম্পর্কসূত্র অধ্যয়ন করলে প্রচারণার বিষয়টি আরো পরিষ্কার হবে। মার্কিন সরকার কিন্তু প্রত্যক্ষভাবে বড়লোকদের সরকার। প্রধান দুটো পার্টিই বড়লোকদের পার্টি। বড়লোক হওয়া ছাড়া সেখানে নির্বাচিতই হওয়া যায় না। তাই বড় বড় সংকটাভিযান পরিচালনার

সময় (যেমন হাল আমলে আফগানিস্তানে 'অপারেশান এনডিউরিং ফ্রিডম') সরকার এবং মিডিয়ার একই সুর আবিষ্কার করা চলে। অথচ সাংবাদিকতা-শাস্ত্রে আছে, মিডিয়ার কাজ নাকি সরকারের কর্মকান্ডের কুত্তা-নজরদারি করা। আফগানিস্তানে সামরিক হামলা পরিচালনার দায়িত্ব পেণ্টাগনের নাকি সিএনএন-এর সেটা তার টিভি-কাভারেজের ক্যাপশান দেখে বোঝা মুশকিল; যেন তারাই মার্কিন সরকারের তথ্যপ্রচার-বিভাগের দায়িত্ব নিয়েছে। ইঙ্গমার্কিন সরকারের 'সন্ত্রাসবিরোধী যুদ্ধ' বা ঘোষিত ক্রুসে-ডের রণদামামার তালে তালে ঢোল-বাজানো সিএনএন-এর ক্যাপশান প্রথমে ছিল "অ্যামেরিকা আণ্ডার অ্যাটাক"। কদিন পর সেটা বদলে হলো "অ্যামেরিকা ইজ অ্যাট ওয়ার"। তারপর, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ওসামা বিন লাদেনকে এক নম্বর শত্রু হিসাবে এলান করার পরে সিএনএন-এর ক্যাপশান হলো "অ্যামেরিকা'জ নিউ ওয়ার"। তারও পরে সেটাকে 'সঠিকভাবে' পরি -শুদ্ধ করে লেখা হলো "অ্যামেরিকা'জ ওয়ার অন টেররিজ্‌ম্"। ওদিকে ফক্স নিউজ চ্যানেল-এ চলল প্রায়-সার্বক্ষণিক "আমেরিকা অ্যাট ওয়ার", বিবিসি-তে "ওয়ার অফ টেররিজ্‌ম্"। যুদ্ধটা তাহলে কার? ইঙ্গমার্কিন সর-কারের, নাকি তাদের মিডিয়ার? তারপরও সব শেয়ালের সুর মেলানো সহজ নয়, বিশেষত শেয়ালসাহেবরা পরস্পর যদি পয়সালোভী প্রতিযোগিতায় 'স্বাধীনভাবে' মত্ত থাকেন। তাই মিডিয়া কখনো-বা টুকটাক বাড়াবাড়ি করে ফেলে তাহলে মিডিয়ার লোকজনকে ডেকে এনে সাংবাদিকতা শেখায় সরকার এবং 'গাইডলাইন' দেয় যে, তোমরা কিন্তু ওসামার ভিডিও টেপ হুবহু প্রচার করবে না, সংক্ষিপ্ত করে নিজেদের ভাষায় গুছিয়ে লিখবে, কেননা ঐ লোকটার মর্মভেদী উচ্চারণ অতিশয় বিষজ্বালাময় [FAIR, 2001], এবং আমরা দেখি যে, 'স্বাধীন' নামে নন্দিত মিডিয়া সত্যি সত্যি তা মেনেও নেয়। এই রকম 'প্রেস অ্যাডভাইস'-মার্কা মিডিয়াকেই সদানন্দ পশ্চিমভক্তরা বলেন যে, উহা সরকারী সেন্সরশিপমুক্ত। সরকার-ও-মিডিয়া যেন তামাক-ও-ফিল্টার-দুজনে-দুজনার ধরনের এই পরিস্থিতিতে সাংবাদিকতার সর্বোচ্চ পুরস্কার পুলিৎজার-জয়ী মার্কিন সাংবাদিক বেন বাগডিকিয়ান ঠিকই খেয়াল করেছেন, বড়লোকদের এই কর্পোরেট-মিডিয়াই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সরকারের 'তথ্য ও সংস্কৃতির প্রাইভেট মন্ত্রণালয়' গঠন ও পরিচালনা করে। বাগডি-

কিয়ান দেখিয়েছেন, মিডিয়ার সংখ্যা আপাত দৃষ্টিতে অনেক হলেও তাঁর গবেষণা-পর্বে মাত্র ২৯টা বৃহৎ মিডিয়া-সিস্টেমের হাতে ছিল মোট সংবাদ-পত্র-আউটপুটের অর্ধেকটা এবং ম্যাগাজিন, ব্রডকাস্টিং, বই ও চলচ্চিত্রের বিক্রয় এবং অডিয়েন্সের বেশিরভাগটা। এই ২৯টা প্রতিষ্ঠান মিলে যা গড়ে উঠেছে, তা হলো একটা নতুন 'প্রাইভেট মিনিস্ট্রি অফ ইনফরমেশন অ্যান্ড কালচার', এরা জাতীয় এজেণ্ডা নির্ধারণ করার ক্ষমতা রাখে। [Bagdikian, 1997]

'মিডিয়া' বা বড়লোকদের ব্যক্তিগত তথ্য মন্ত্রণালয় মার্কিন মুসলমান-দের বেলায় কীভাবে সিস্টেমেটিক প্রচারণা চালায় সেটাই এই প্রবন্ধের উপ-জীব্য।

পশ্চিমা সমাজের খ্রিস্টীয় মনোগঠন এবং মুসলমানের অপরায়ন

পশ্চিমা সমাজে 'সংখ্যালঘু'র অপরায়ন-প্রক্রিয়া যথাযথভাবে হৃদয়ঙ্গম করার উদ্দেশ্যে অন্য একটা বিষয়ের প্রতিও আমি পাঠকের মনোযোগ টানতে চাই। এ-কথা ঠিকই, পশ্চিমা সমাজের স্বরূপ বোঝার সময় ভুলে যাওয়া যায় না যে, সেটা একটা পুঁজিবাদী সমাজ। বলতে গেলে, আন্তর্জাতিক কর্পোরেট পুঁজি-বাদী ব্যবস্থার রাজধানী এই সমাজ; সর্বব্যাপী ব্যবসামুখী স্বয়ংক্রিয় ধাঁচের টেকনোলজি-নির্ভরতা এই সমাজের প্রধান চালিকাশক্তি। এই সমাজের অধিপতি শ্রেণীর সামাজিক আধিপত্যের রূপকাঠামো বিশ্লেষণে তাই অর্থ-নৈতিক শ্রেণীবিচার করা স্বাভাবিক হলেও তাতে করে সেখানকার অধিপতি শ্রেণীর অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক আধিপত্য সম্পর্কে জানা যায় ঠিকই, কিন্তু ঐ শ্রেণীর ধর্মীয়-বর্ণগত-জাতিগত-সাংস্কৃতিক আধিপত্যের চেহারাটা আড়ালে থেকে যায়। আড়ালে চলে যায় এই সত্য, পশ্চিমা সমাজ শুধু পুঁজিবাদী সমাজই নয়, এটা একটা খ্রিস্টান-সমাজও বটে। পশ্চিমা সমাজে মুসলমান ও অপরাপর সংখ্যালঘুর অপরায়নের মাজেজা পুরোপুরি বুঝতে গেলে ঐ সমাজের খ্রিস্টীয় মনোগঠনের দিকটা বিশ্লেষণ করাও তাই জরুরী হয়ে পড়ে।

সত্যি কথা বলতে কি, চোখ-ধাঁধানো চোখ-রাঙানো মার্কিন মুল্লুকের বেহেস্তে পদার্পন ঘটানোর মতো পূণ্য অর্জন করতে এখনও যেহেতু পারি নি,

পশ্চিমের সমাজকে আদৌ ‘খ্রিস্টান-সমাজ’ বলে ডাকা যায় কিনা সেটা নিয়ে আমি একটু চিন্তিতই ছিলাম, বিশেষ করে এই প্রবন্ধের উপশিরোনাম লিখতে যেয়ে থেমে থাকতে হয়েছে অনেকক্ষণ। শিরোনামের প্রধান অংশটা ঠিক করে ফেলতে পারার পরে ভাবলাম মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বিভিন্ন ধর্মের অনুসারী লোকসংখ্যার হিসাবনিকাশ পেশ করতে পারলে মন্দ হয় না। খুলে বসলাম *এনসাইকোপিডিয়া ব্রিটানিকা সিডি-রম ডিলাক্স সংস্করণ ২০০২*। দেখা গেল, পশ্চিমা সমাজটাকে সত্যি-সত্যি ‘খ্রিস্টান-সমাজ’ হিসেবে নাম ধরে ডাকা যেতে পারে, পশ্চিমা বিদ্যা-মহাজনদের বিদ্যাই সেই কথা বলে। নির্দ্বিধায় তাঁরা সারা দুনিয়াটাকে খ্রিস্টান ও অ-খ্রিস্টান এই দুই ভাগে ভাগ করে দেখেন। ব্রিটানিকার পণ্ডিতদের কথা বলছি। পৃথিবীর বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে কাদের সংখ্যা কত তা জানানোর জন্য ওঁদের বানানো জনসংখ্যা-টেবিলটা কম্পিউটারে খুলে দেখেন: সারা দুনিয়ার লোককে অবলীলাক্রমে (কর্তাদের এই লীলা বোঝা ভার হলেও একটা বোঝাপড়া তো করা চাই!) তাঁরা খ্রিস্টান ও অখ্রিস্টান এই দুই মোটা দাগে কীভাবে ভাগ করে নেন তা বুঝায়ে বলার দরকার পড়ে না [Britannica, 2002-b]। ঐ যে ওঁরা বললেন অ-খ্রিস্টান, তাদের মধ্যে সংখ্যায় সবচে বেশি হচ্ছে মুসলমানরা। আস্তে আস্তে এই প্রবন্ধে আমরা দেখব, এদেরকেই পশ্চিমওয়ালারা তাঁদের সমাজের ‘মহাসর্বনাশ’-এর উৎস বলে বিবেচনা করতে শুরু করেছে, এবং তা অনেক দিন থেকেই। কেন? পশ্চিমে বসবাসকারী মুসলমানরা কি ঐ সমাজের দৈনন্দিন স্বাভাবিকতায় বিঘ্ন ঘটিয়ে চলেছে? তা কিন্তু মোটেও নয়। তাঁরা আসলে শ্বেতাঙ্গ-খ্রিস্টান নয় বলেই পরিত্যাজ্য, নিন্দনীয়, এখনও-সভ্য-হয়ে-না-ওঠা, অপর। পশ্চিমা সমাজের ভাঁজে-ভাঁজে খেলতে থাকে এই অপরায়নের, তথা দানবায়নের, হাওয়া — খোলা হাওয়া, মুক্ত হাওয়া যার নাম।

পশ্চিমা সমাজের খ্রিস্টীয় মনোগাঠনিক বৈশিষ্ট্যের স্বরূপ উপলব্ধি করবার জন্য এবারে কতকগুলো উদাহরণ পেশ করতে চাই। অতি সাম্প্রতিক কয়েক-টা উদাহরণ নিয়েছি বেলজিয়ামভিত্তিক ইওরোপিয়ান নেটওয়ার্ক এগেইন্স্ট রেসিজ্‌ম্‌-এর সহসভাপতি, এবং *মিডিয়া ওয়াচ*-এর সম্পাদক ব্যাশি কুরায়-শির কাছ থেকে। ভারতে জন্ম-নেয়া, পাকিস্তানে বড়-হওয়া, আমেরিকা ও

ইংল্যান্ডে পড়ালেখা-করা, বর্তমানে ডেনমার্কে বসবাসকারী, জাতিগত 'সংখ্যালঘু'দের ওপর একাধিক গ্রন্থের প্রণেতা কুরায়শি বলছেন:

> যেকোনোভাবেই হোক পশ্চিমা দুনিয়ায় বসবাসের পর একটা জিনিস আমার কাছে খুবই পরিষ্কার যে, যতোই কেন-না আমি সেক্যুলার হই, যতোই কেননা আমি ধর্মচর্চাকারী না-হই তাতে কিছু যায়-আসে না। আমার চারপাশের মিডিয়া, রাজনীতিবিদরা এবং লোকজনেরা সব-সময়েই আমাকে মনে করিয়ে, দেবে যে আমি একজন মুসলমান, এবং সেই জন্যেই আমি ডেনমার্কীয়, ইওরোপীয় এবং/অথবা পশ্চিম-ইও-রোপীয় সংস্কৃতির স্বাভাবিক অংশ নই। এটা ভাবতে আমার মন খারাপ হয়ে যায় এবং আঘাত লাগে যে, ডেনমার্কের আইনমান্যকারী, ট্যাক্স-প্রদানকারী, শান্তিকামী ও সাধারণ-স্বাভাবিক শরীক একজন নাগরিক হয়ে ওঠার জন্যে আমার সমস্ত প্রচেষ্টার কোনো দামই এই সমাজের কাছে নেই। আমাকে আমার ধর্মপরিচয়ের মানদণ্ড দিয়ে বিচার করা হয়। আমি জানি আমার একারই শুধু এই অবস্থা নয়। পশ্চিমা জগতের মিলিয়ন মিলিয়ন মানুষের একই অবস্থা। [Quraishy, 2001] (অনুবাদ আমার — স.র.ন.)

কুরায়শির উদ্ধৃতির অক্ষরগুলোর অর্থ-তাৎপর্য ঠিকমতো পাঠ করতে পারার দরকার আছে। একজন মুসলমান শুধু মুসলমান হওয়ার কারণেই 'স্বাভাবিক ইওরোপীয়' হতে পারেন না। কেন? কী হতে পারে এর কারণ? কারণ হলো, আগেই বলেছি, পশ্চিমা সমাজ একটা খ্রিস্টানসমাজ আর মুসলমানরা খ্রিস্টান নন। ভুলে গেলে চলবে না, কালোরাও কিন্তু 'স্বাভাবিক' মার্কিন বা ইওরোপীয় নাগরিক বলে বিবেচিত হন না। কারণ তাঁরা 'স্বাভাবিক' শ্বেতাঙ্গ নন। খ্রিস্টানরা 'স্বাভাবিক', মুসলমানরা 'অস্বাভাবিক'; শ্বেতাঙ্গরা 'স্বাভাবিক', আর কৃষ্ণাঙ্গরা 'অস্বাভাবিক'। (পাঠককে একটু মনে করিয়ে দিই, হিন্দুরাও কিন্তু বাংলাদেশের মুসলমান-মনোগাঠনিক বুননসম্পন্ন সমাজের 'স্বাভাবিক' নাগরিক নন; আর ভারতের পরিস্থিতিও তাই — তবে ঠিক উল্টো দিক থেকে।) এইভাবে, পশ্চিমাসমাজে 'বিধর্মী' 'অস্বাভাবিক'

‘অপর’ ‘সংখ্যালঘু’র তথা মুসলমানের সামাজিক পরিচয় তৈয়ার করার কায়দাকানুন বা সামাজিক প্রকৌশল জারি থাকে।

পশ্চিমের ‘সুশীল’ সমাজের পণ্ডিতেরা মুসলমানদের কীরকম ‘বহিরাগত’ ‘অপর’ হিসাবে দেখেন তার আরও নমুনা দেখা যাক:

> মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ইওরোপীয় দেশগুলোতে মুসলমানদের ক্রমবর্ধমান উপস্থিতি বিভিন্ন উপায়ে নজরে আনা যেতে পারে: ওয়াশিংটন ডিসি-র পাবলিক স্কুল-সিস্টেমকে জানুয়ারি মাসে রোজার সময় মুসলমান স্কুল-শিশুদের চাহিদার স্বীকৃতি দিতে হয়েছে। জুন মাসে নিউ ইয়র্ক শহরের শিক্ষাবোর্ড কতিপয় স্কুল-সেটিংস্-এ মুসলমানদের নানা প্রতীক প্রদর্শন করতে রাজি হয়েছে যেখানে খ্রিস্টান ও ইহুদি প্রতীক আগে থেকেই ছিল। জুন মাসেই নাইকি ইনকর্পোরেটেডকে [জুতার কোম্পানি] বাস্কেট-বল খেলার জুতার একটা বিশেষ ব্র্যান্ড প্রত্যাহার করে নিতে হয়েছে যার লোগোটা ছিল এমন যে চাইলে আরবিতে সেটাকে আল্লার নাম হিসাবে-ও পড়া যেতে পারে। আঘাত করে থাকলে তার জন্যে মুসলমানদের কাছে ক্ষমা চায় কোম্পানি। মে মাসে সাইমন অ্যান্ড শুস্টার নামের এক মার্কিন প্রকাশক একটা শিশুগ্রন্থ প্রত্যাহার করে নেয় যাতে নবী মুহাম্মদকে হীনভাবে তুলে ধরা হয়েছিল। হার্টফোর্ড শহরে খ্রিস্টান-মুসলমান আন্তঃ -বিশ্বাস সংলাপ ও গবেষণায় দীর্ঘ দিন থেকে আগ্রহী ‘কন’, মানে হার্ট-ফোর্ড সেমিনারি, এবং হার্টফোর্ড-বিশ্ববিদ্যালয় ইব্রাহিমীয় ধর্মসমূহের ভিজিটিং প্রফেসরের নয়া বহাল-করা একটা চেয়ারে প্রথমবারের মতো কাউকে নিয়োগ দিয়েছে। অতিথি-মনোনয়নলাভকারী লোকটি হচ্ছেন সুলায়মান নেয়াং, একজন মুসলমান এবং ওয়াশিংটন ডিসি-র হাওয়ার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের আফ্রিকান স্টাডিজের অধ্যাপক। এরকম চেয়ার বিরল এবং তা তাৎপর্যপূর্ণ বুদ্ধিবৃত্তিক ও ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ তুলে ধরে। [Britannica 2002] (অনুবাদ আমার; মোটা হরফ আমার — স.র.ন.)

রোজার মাসে স্কুলে মুসলমান বাচ্চাদের আলাদা চাহিদার স্বীকৃতি, স্কুলের নানান কাগজপত্র ইত্যাদিতে এতদিন ধরে চলে আসা খ্রিস্টান ও ইহুদি

প্রতীকসমূহের পাশাপাশি মুসলমান প্রতীক ব্যবহার চালু করা, মুসলমান প্রফেসরকে ভিজিটিং প্রফেসর নিয়োগ করা — ইওরোপে এসব হলো বিশাল 'তাৎপর্যপূর্ণ' ঘটনা। কী তাৎপর্য? ইওরোপীয় সমাজে 'অপর' মুসলমানদের 'অনুপ্রবেশের' স্বীকৃতি ঘটছে। লক্ষণীয় যে, অধ্যাপক সুলায়মানের পরিচয় হিসাবে প্রথমে বলা হচ্ছে তিনি "একজন মুসলমান", তার পর বলা হচ্ছে, "এবং ওয়াশিংটন ডিসি-র হাওয়ার্ড-বিশ্ববিদ্যালয়ের আফ্রিকান স্টাডিজের অধ্যাপক।" কী 'সভ্য' দৃষ্টিভঙ্গী! (আমাদের দেশেও হিন্দু ধর্মাবলম্বী কোনো পেশাজীবীকে পরিচয় করিয়ে দিতে গেলে বলা হয়, "হিন্দু ভদ্রলোক"; পদস্থ কেউ যদি হিন্দু হন তবে সেটা আলাদা করে লক্ষ করা হয়, কিন্তু যদি তিনি হন মুসলমান তাহলে সেটা আর লক্ষণীয় ব্যাপার থাকে না।) পাঠক, আপনি চাইলে এও লক্ষ করে থাকতে পারেন, নাইকি কোম্পানির জুতায় এমন লোগো তাহলে সত্যি সত্যি ব্যবহার করা হয়েছিল যেটাকে আরবিতে আল্লার নাম হিসাবে পড়া যায়! এবং বাচ্চাদের বইতে নবী মুহাম্মদ সম্পর্কে হীন ধারণা প্রদান করাও হয়েছিল সত্যি-সত্যি! একটা দেশে, যেখানে মুসলমানদের সংখ্যা নিতান্ত নগণ্য, সেখানে ঐ অল্পসংখ্যক লোকের প্রতি খ্রিস্টীয় মনোভাব এতে পরিষ্কার ধরা পড়ে না কি? পরিষ্কার কি বোঝা যায় না যে, এটা এমন একটা খ্রিস্টান-সমাজ যেখানে ব্যবসায়ীরা জুতায় তাঁদের চোখে 'বিধর্মী' মুসলমানদের আল্লার নাম লেখে, আর বাচ্চাদের বইতে তাদের নবী সম্পর্কে হীন জ্ঞান দেয়া হয়?

ব্রিটানিকার ঐ একই প্রবন্ধ [Britannica 2002] থেকে আরো জ্ঞান লাভ করা যায় পশ্চিমা সমাজের খ্রিস্টীয় মনোগাঠনিক ভিত্তি সম্পর্কে। জানা যায়, ঐ সমাজে ইসলামের প্রসারের কারণে সমাজে, তাঁদের ভাষায়, 'নানা-রকম সমস্যা' দেখা দিচ্ছে। আরও জানা যায়, সেখানকার মুসলমান-সমাজের নেতারা অভিযোগ করেছেন যে, মুসলমান মানেই সহিংস — এরকম ঢালাও, একপেশে, বর্ণবাদী ব্যাখ্যা মিডিয়া দিচ্ছে। ব্রিটানিকা-ওয়ালারাই বলছেন যে, মুসলমান-সমাজের নেতারা অবশ্য চেষ্টা করছেন তাদের সম্পর্কে প্রকৃত তথ্য মানুষের সামনে তুলে ধরতে কিন্তু সমস্যা হচ্ছে সেখানেও, ঐ একই কারণে, ইসলাম প্রসারের কারণে। ফলে মিডিয়া থেকে সহযোগিতা পাওয়া যাচ্ছে না। তার মানে ব্রিটানিকা কিন্তু স্বীকারই করছে যে,

ইওরোপীয়-মার্কিন মিডিয়াতে মুসলমানদের যথাযথ চিত্রায়নের ক্ষেত্রে কিছু-না-কিছু সমস্যা আছে, এবং এই সমস্যার কারণ হলো ঐ সমাজে ইসলামের প্রসার। এই তাহলে পশ্চিমা মিডিয়ার ইসলামের প্রসার প্রতিহত করার কায়দা। পরিস্থিতি এরকমই; অস্বীকার করার উপায় ব্রিটানিকারও নেই! ভালো করে না-জেনে-বুঝে আমাদের দেশের শিক্ষিত ও প্রগতিশীল বলে দাবিদার লোকেরা এই সমাজকে 'সেক্যুলার' বলে ভাবতে ভালোবাসেন। একেবারে শুরুতে বলেছিলাম, এখন আবার মনে করিয়ে দেই, এর জন্য দায়ী কিন্তু মনোজগতে আধুনিকতা নামক ঔপনিবেশিক জ্ঞানকান্ডের উপনিবেশ।

এবারে বিশ্বনন্দিত পণ্ডিত এডওয়ার্ড উইলিয়াম সাঈদের একটা অভিজ্ঞ-তার কথা বলব। তার কথার মানে ঠিকঠাক মতো বোঝার জন্যই তাঁর পরিচয়টা একটু পেশ করে রাখতে চাই। সাঈদ জন্ম নিয়েছেন জেরুজালেমে, ১৯৩৫ সালে। ছোটবেলায় লেখাপড়া করেছেন জেরুজালেম ও কায়রোর পশ্চিমা স্কুলে। তারপর যুক্তরাষ্ট্রের প্রিন্সটন- ও হার্ভার্ড-বিশ্ববিদ্যালয়ে চুকিয়ে-ছেন আনুষ্ঠানিক শিক্ষার পাট। জন্মসূত্রে আরব-খ্রিস্টান ও পৈতৃকসূত্রে মার্কিন এই নাগরিক সাম্প্রতিক লেখায় জানিয়েছেন:

> অজ্ঞতাপ্রসূত হয়ে পাশ্চাত্য এবং ইসলাম সম্পর্কে মার্কা এঁটে দেওয়ার এটাই হচ্ছে সবচেয়ে বড় সমস্যা। ওই এঁটে দেওয়া তকমা মনকে বিভ্রান্ত ও বিপথগামী করে। আর এমন সব বিভ্রান্ত বিষয়কে সত্য হিসেবে আমাদের সামনে সারিবদ্ধ করে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হয় যে যথার্থ সত্যের উপলব্ধি আমাদের হয় না। এ প্রসঙ্গে আমার মনে পড়ছে ১৯৯৪ সালের একটি ঘটনার কথা। ওয়েস্ট ব্যাংক বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি বতৃতা দেবার পর দর্শকসারি থেকে একজন লোক দাঁড়িয়ে 'পাশ্চাত্য' সম্পর্কে আমার বক্তব্যকে আক্রমণ করতে শুরু করল। যেমনভাবে গোঁড়া ইসলামপন্থীরা পাশ্চাত্যকে আক্রমণ করে তেমনি। কিন্তু বিস্ময়ের সঙ্গে খেয়াল করলাম এক পর্যায়ে সে রাগত স্বরে বলল,'তাহলে আপনি স্যুট টাই পরেছেন কেন, ওগুলো তো পশ্চিমাদের?' কথাটা বলেই সে বসে পড়ল। [সাঈদ, ২০০১]

কী অদ্ভূত কথা! পশ্চিমা মানেই স্যুট-টাই পরা, আর স্যুট-টাই পরা মানেই পশ্চিমা হয়ে যাওয়া! তার মানে, এক দিকে, স্যুট-টাই না-পরলে পশ্চিমা হওয়া যায় না (কারণ তা তাঁদের 'স্বাভাবিক' পোশাক), আর অন্য দিকে, আপনি যদি পশ্চিমের নানান অসঙ্গতির কথা তোলেন, তাহলে আপনি স্যুট-টাই পরার যৌক্তিকতা হারান। আমরা কি বুঝতে পারছি, পশ্চিম-উপনিবেশ-খ্রিস্টায়ন-অপরায়ন কেমন করে একাকার হয়ে থাকে?

পশ্চিমা সমাজের খ্রিস্টীয় মনোগঠন এমনই যে, এমন-কি প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরে এবং অতিশয় ব্যক্তিগত বন্ধুত্বের মধ্যেও ঐ মনোগঠন এসে বাধা হয়ে দাঁড়ায়, তৈয়ার করতে থাকে 'সংখ্যালঘু' মুসলমানের সামাজিক পরিচয়। মোটেও মনোহর নয় সেই পরিচয়। কুরায়শি বলছেন, ১১ সেপ্টেম্বরের পরে ব্যক্তিগতভাবে তিনি প্রচুর আক্রমণাত্মক পরিস্থিতির মখোমুখি হয়েছেন; শুধু ডেনমার্কে নয়, সুইডেন, জার্মানি, এমনকি পর্তুগালের মতো দেশেও; প্রকাশ্য জায়গায় চোখরাঙানি, রাস্তায় থুতু নিক্ষেপ, এবং মিডিয়ার কাছ থেকে অস্বস্তি-কর প্রশ্ন — এইসব তাঁকে মোকাবেলা করতে হয়েছে [Quraishy, 2001]।

১১ সেপ্টেম্বরের পরে যে-দুইটা ঘটনায় কুরায়শি সবচে বেশি আঘাত পেয়েছেন তাদের মধ্যে প্রথমটা তাঁর খুব ভালো এক বন্ধুর কাছ থেকে যিনি বিনয়ী, শিক্ষিত এবং জাতিগত 'সংখ্যালঘু'দের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন; তাঁদের মধ্যকার অনেক লোকের সাথে তাঁর বন্ধুত্বও আছে। সেই বন্ধু ভদ্র-লোক ব্যাশি কুরায়শিকে ই-মেলে লিখেছেন:

> প্রিয় ব্যাশি, আমি তোমাকে অনেক দিন ধরে চিনি। তুমি সবচে পরি-শীলিত মানুষদের একজন। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সন্ত্রাসী হামলার পর আমাদের রাস্তা আলাদা করা ছাড়া পথ নেই। আমরা ডেনমার্কীয়রা এবং তোমরা মুসলমানরা আর এক সাথে বসবাস করতে পারি বলে আমার মনে হয় না। [Quraishy, 2001] (অনুবাদ আমার — স.র.ন.)

এমনই এই পশ্চিমা সমাজের খ্রিস্টীয় মনোগঠন যে, রীতিমতো উদার ভালোমানুষ একজন নাগরিকের সাথে আরেকজন একইরকম নাগরিকের বন্ধুত্ব টেকে না কেবলমাত্র এই কারণে যে, তাঁদের একজন ধর্মপরিচয়ের দিক থেকে মুসলমান। ১১ই সেপ্টেম্বরের পর মুসলমানদের বিরুদ্ধে পশ্চিমা প্রচারণা

-মাধ্যমের বিদ্বেষায়নের মাত্রা কতটা বিস্তৃত হলে এমনটা সম্ভব তা কি ভেবে দেখার মতো নয়? পাঠক, আমি কি বোঝাতে পারছি, পশ্চিমা প্রচারণামাধ্যম পশ্চিমা সমাজের খ্রিস্টীয় মনোগঠনের অনিবার্য প্রতিফলনই ঘটায় না শুধু, ঐ মনোগঠনটাকে নিত্যদিন নবায়নও করে?

এবারে মুসলমান নাগরিকদের আনুগত্য ও সুনাগরিকত্ব বিষয়ে একজন ‘সভ্য’ প্রধানমন্ত্রীর হেদায়েত প্রসঙ্গে জনাব কুরায়শির অভিজ্ঞতা বর্ণনা করতে চাই। প্রচারণামাধ্যমের উপরোক্ত মনবিষানো প্রচারণার বিরুদ্ধে নালিশ জানাতে নয়, বরং ১১ সেপ্টেম্বরের পরের পরিস্থিতি কীভাবে সামলানো যায় তা নিয়ে আলাপের জন্য ডেনমার্কের প্রধানমন্ত্রী পোল নাইরাপ রাসমুসেনের সাথে প্রাইভেট মিটিং ছিল কুরায়শিদের সংগঠন বর্ণবাদ-বিরোধী ইউরোপীয় নেটওয়ার্ক এর সাথে। জাতিগত দিক থেকে ‘সংখ্যালঘু’ এমন সংগঠনসমূহের এই জোটের প্রতিনিধিদের সাথে কোনো কথাবার্তায় না-গিয়ে তাঁদেরকে তিনি হেদায়েত দিতে শুরু করলেন: “সন্ত্রাসবাদকে নিন্দা করো, লেখাপড়া ঠিকমতো শেখো, গণতন্ত্রের আদর্শগুলোকে সম্মান দেখাও, আর ডেনমার্কের সংবিধানের ওপরে কোরাণকে স্থান দেয়ার মতো অনুচিত কাজ করো না” [Quraishy, 2001]। প্রতিনিধিরা তো হতভম্ব। প্রধানমন্ত্রী পর্যন্ত তাঁদের সুনাগরিকত্ব এবং ডেনমার্কের প্রতি আনুগত্য নিয়ে এরকম বর্বরভাবে প্রশ্ন তুললেন কেন তা তাঁরা বুঝতে পারছিলেন না। অথচ ঐ প্রতিনিধিদের বেশিরভাগই তাঁদের সারা জীবন কাটিয়েছেন ডেনমার্কে, কিন্তু তাঁদের জন্ম মুসলমান ঘরে হওয়াতে দেশের প্রতি তাঁদের আনুগত্য নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী!! পরের দিন মিডিয়ায় খবরটা পরিবেশন করা হলো এভাবে: “প্রধানমন্ত্রী মধ্যপন্থী মুসলমানদের সাথে সাক্ষাৎ করেছেন।” কী পরিহাস!

ইসলামের বিরুদ্ধে পশ্চিমের মিডিয়া-ক্রুসেড

১৯৯৫ সালেই স্যাম হুসেইনির কাছে মনে হয়েছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এলিট মিডিয়া ও সেই দেশের জ্ঞানরাজ্যের বিশেষজ্ঞবৃন্দ ইসলামের বিরুদ্ধে ‘নয়া ক্রুসেড’-এ লিপ্ত আছেন [Husseini, 1995]। পাঠক, লক্ষ করুন, পশ্চিমা মহাপ্রফেসর, ঠাণ্ডা যুদ্ধের সময়কার তাত্ত্বিক, স্যামুয়েল হান্টিংটন ১৯৯৩ সালে তার সভ্যতার সংঘাতের তত্ত্ব হাজির করতে গিয়ে [Huntington,

1993] বলেন, "... পশ্চিম ও ইসলাম ১৩০০ বছর ধরে সংঘাতে লিপ্ত, এই সংঘাত থামার আশা নাই।" পশ্চিমা শাসকশ্রেণী ও তাঁদের মতাদর্শিক পণ্ডিত -যোদ্ধাগণ কখনো এই সংঘাতের কথা ভোলেন না। তাঁরা সেই ক্রুসেড থামার কোনো আশাও দেখেন না। তারা বরঞ্চ সেই ক্রুসেডকে আরো এগিয়ে নিয়ে গিয়ে সারা পৃথিবীর ওপর পশ্চিমের একচেটিয়া আধিপত্য কায়েম করতে চান। সেই ১৯৯৩ সালেই প্রফেসর হান্টিংটন পশ্চিমা নেতাদেরকে সবক দিচ্ছেন কীভাবে ইসলামকে মোকাবেলা করা যেতে পারে। তিনি বলছেন, ইসলাম এবং কনফুসীয় সভ্যতা পশ্চিমের জন্য "হোস্টাইল" সভ্যতা, এদের সামরিক শক্তিকে বাড়তে দেয়া পশ্চিমের জন্য ঠিক কাজ হবে না;, বরং পূর্ব্ক্ষ ও দক্ষিণপূর্ব এশিয়াতে আমেরিকার সামরিক শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রাখতে হবে। তার মানে পশ্চিমের দিক থেকে ক্রুসেডের সামরিক প্রস্তুতি অব্যাহত আছে অনেক আগে থেকেই; অথচ ক্রমাগতভাবে তাঁরা দোষ দিয়ে চলেছেন তারা ইসলামকে। দোষ দেয়া চলছে এই মর্মে যে, ইসলামই সহিংস, সন্ত্রাসী — মজ্জাগতভাবে।

পশ্চিমের এই ক্রুসেডার-মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায় বার্নার্ড লুইসের লেখায়। "মুসলমানদের দুর্বার ক্রোধের শেকড়" নামের প্রবন্ধে তিনি লিখ-ছেন, মুসলমানদের দুর্বার ক্রোধের কারণ হলো, তারা আসলে একেবারে ভেতর থেকেই পশ্চিমা সভ্যতার বিরোধী, পশ্চিমের নীতিবোধ-মূল্যবোধকে তারা মেনে নিতেই পারে না — তাই তারা সন্ত্রাসী [Lewis, 1990]।
এইভাবে পশ্চিমা প্রচারণামাধ্যম ও তার পণ্ডিতবর্গ ইসলামের একটা নেতি-বাচকভাবে মুসলমানদের সামাজিক পরিচয় বা ইমেজ নির্মাণের মাধ্যমে তার বিরুদ্ধে মিডিয়া-ক্রুসেড অব্যাহত রাখে। টেলিভিশনের টক শোগুলোও তাদের অবদান রাখতে পিছপা হয় না। "This Week with David Brink-ley" নামের একটা টিভি টক শো'র ২৭ জুন ১৯৯৩ এর অনুষ্ঠানের বক্তারা ইসলামের বিরুদ্ধে জেহাদী জোশে বলছিলেন, পশ্চিমের অস্তিত্বটাই ইসলামী মৌলবাদের উদ্ভবের গোড়ার কারণ; কাজেকাজেই পশ্চিমকে সতর্ক থাকতে হবে এমন একটা মুসলিম মৌলবাদ সম্পর্কে যারা পশ্চিমকে ঘৃণা করে; শুধু তাই নয়, এর বিরুদ্ধে পশ্চিমকে যুদ্ধ করা ছাড়া কোনো রাস্তাই খোলা নাই — যেখানে এদেরকে দেখা যাবে সেখানেই এর বিরুদ্ধে লড়তে হবে — এখনো

কেন যে পশ্চিম সেটা পর্যাপ্তভাবে করছে না! "সমস্ত সাক্ষ্যপ্রমাণ এই কথা বলছে, ওরা আমাদের ঘৃণা করে। আমরা মদ্যপান করি। আমরা উচ্ছৃঙ্খল, যা যা ওদের অরুচি আমরা তাই তাই ...।" "আমাদের গণতন্ত্র আর মানবাধিকারও আছে, আরো নানাকিছু আছে — এগুলো ওদের কাছে আশ্চর্য বস্তু।" "এগুলো ওরা ঘৃণা করে।" কী চমৎকার প্রচারণা: মুসলমান মানেই গণতন্ত্র ও মানবাধিকারের যম-বিরোধী। তাদের 'পশ্চাদপদতার' সামাজিক-ঐতিহাসিক-ঔপনিবেশিক কোনো প্রকার কারণ নেই। মুসলমানদের রক্তের মধ্যেই তাহলে গণতন্ত্র ও মানবাধিকার-বিরোধিতা আছে। পাঠক, এই হয় পশ্চিমা প্রচারণামাধ্যমের প্রচারণার নমুনা। আর এবার, ১১ সেপ্টেম্বরের পরের কালে, প্রেসিডেন্ট বুশ তো সরাসরি "ক্রুসেড"-ই ঘোষণা করে দিলেন। ইতালির প্রধানমন্ত্রী বারলুসকোনি তো এতোদূর অব্দি গেলেন যে বলেই বসলেন: ইসলামী সভ্যতা খ্রিস্টান পশ্চিমের চেয়ে হীন। এদিকে, ডেনমার্কের পিপলস পার্টি-র নেতা আরো এক ধাপ এগিয়ে ড্যানিশ পার্লামেন্টের মঞ্চে দাঁড়িয়ে ইসলামের বিরুদ্ধে একেবারে যুদ্ধ ঘোষণা করে দিয়েছেন গত ৫ অক্টোবর। [Quraishy, 2001]

এহেন 'মুক্ত' সমাজে 'সংখ্যালঘু' হিসেবে মুসলমানদের সামাজিক পরিচয় নির্মাণের বেলায় যে-দিকগুলো পশ্চিমা প্রচারণামাধ্যম খেলিয়ে তোলে তার কায়দাকানুনগুলোর কিছু নমুনা এবারে দেখা যাক।

মুসলমান, তোমার নাম কী? ধর্মে পরিচয়।

ডেনমার্কের প্রধানমন্ত্রীর সাথে সাক্ষাৎকালে (যে-কথা ওপরে একটু আগে বলা হয়েছে) বর্ণবাদবিরোধী ইওরোপীয় নেটওয়ার্কের 'সংখ্যালঘু' প্রতিনিধি-দলটাতে ৮ জন মেয়ে ছিলেন। তাঁরা সবাই 'স্বাভাবিক' ইওরোপীয় পোশাক-পরা ছিলেন, শুধু সোমালীয় এক মেয়ের মাথায় ছিল স্কার্ফ। পর-দিনের মিডিয়া কেবল ঐ প্রতিনিধি মেয়েটার ছবি ছাপল। এটা হলো 'সংখ্যা-লঘু' মুসলমানদের সামাজিক ভাবমূর্তি বানানোর বেলায় পশ্চিমা প্রচারণা-মাধ্যমের অন্যতম কায়দা — মুসলমানদেরকে শুধু তাঁদের ধর্মীয় পরিচয়ে চিহ্নিত করা। ভাবখানা এমন, যেন মুসলমানের আর কোনো সামাজিক বা পেশাগত পরিচয় থাকতে পারে না। একজন খ্রিস্টান-ব্যক্তি ডাক্তার বা

রাজনীতিবিদ হতে পারেন, কিন্তু একজন মুসলমানের পরিচয় হচ্ছে যে, সে মুসলমান, ব্যস, আর কিচ্ছু না।

এই ধারারই আরেকটা দৃষ্টান্ত: ১৯৯৩ সালে বিশ্ব-বাণিজ্যকেন্দ্রে হামলা বিষয়ক মামলার সংবাদ পরিবেশন করতে যেয়ে এপি'র এক শিরোনামে [AP, March 5, 1994] লেখা হয়, "মুসলমানরা অভিযুক্ত" [Husseini, 1995]। পাঠক, দেখুন, যে-লোকগুলো মামলায় অভিযুক্ত হলো, তাদের দলীয়-রাজনৈতিক বা আর্থ-সামাজিক বা নিদেনপক্ষে অপরাধগত অন্য কোনো পরিচয় নেই; একটাই পরিচয় তাদের; তারা মুসলমান। হুসেইনি তাই ন্যায্য প্রশ্ন তুলেছেন: এপি বা অন্য কোনো প্রচারণামাধ্যম কখনো কি লিখবে "ইহুদিরা অভিযুক্ত"? গর্ভপাত-বিরোধী জঙ্গিদের সম্পর্কে কি কখনো লেখা হবে যে, এরা "খ্রিস্টান মারদাঙ্গায়" লিপ্ত? সবাই জানেন, তবু মনে করিয়ে দিচ্ছি, এপি কিন্তু যেনতেন কোনো ফুচকা-প্রতিষ্ঠান নয়। এটা মার্কিন যুক্ত-রাষ্ট্রের সবচে পুরোনো এবং সবচে বড় সংবাদ-সংস্থা। এর জন্ম সেই ১৮৪৮ সালে। সংবাদ এবং শিরোনাম লেখার 'নিয়মকানুন' আমরা উনাদের কাছ থেকেই শিখি। আমাদের এবং বিশ্বের আরো অনেক দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে সাংবাদিকতা শেখানোর বিভাগগুলোতে সম্পাদনা শেখানোর যে-স্টাইলশিট অনুসরণ করা হয়, সেটা এই এপি-ইউপিআই-স্টাইলশিট। (ইউপিআই বা ইউনাইটেড প্রেস ইণ্টারন্যশনাল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আরেকটা বিশাল সংবাদ-সংস্থা।)

মুসলমানদের বেলায় তাঁদের ধর্মপরিচয়টাকেই সবচেয়ে বেশি করে সামনে আনার আরেকটা দৃষ্টান্ত দেয়া যাক। ২০০০ সালের ১৫ই সেপ্টেম্বরে বিবিসি-তে অস্ট্রেলিয়ার সিডনিতে অলিম্পিকের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের ধারাবিবরণী দিতে গিয়ে ভাষ্যকার সাহেব সব দেশের বেলায়ই খেলাধুলায় সে-দেশের অর্জন বা সে দেশের ইতিহাস বা বিশেষ কোনো ভালো দিক বলছিলেন, এবং সেটাই রীতি; কিন্তু যখনই কোনো মুসলমান-প্রধান দেশের পালা আসছিল তখনই তাঁর গুলো দিয়ে বেরুচ্ছিল ইসলাম, সন্ত্রাসবাদ, মৌলবাদ, গৃহযুদ্ধ প্রভৃতি প্রসঙ্গ; এবং আলজেরিয়া, সুদান, মালয়েশিয়া, পাকিস্তান, সৌদি আরব প্রভৃতি হরেক কিসিমের দেশকে ঐ এক 'ইসলামী' পরিচয়ে চিহ্নিত করা হচ্ছিল [Quraishy, 2001]। পশ্চিমা প্রচারণামাধ্যমকে খেলার মাঠেও

এভাবে আঙুল উঁচু করে বলতে হয়, ঐ যে মুসলমান! পাঠক, পশ্চিমা প্রচারণামাধ্যমের সামাজিক-সাংস্কৃতিক অপরায়নের কায়দা এই প্রকারেরও হয়; হামেশাই।

মুসলমান মানেই মৌলবাদী

পশ্চিমা শাসকশ্রেণী এবং তাঁদের প্রচারণামাধ্যমের সবচে বড় টার্গেট এখন মৌলবাদ। এটা তাঁরা প্রকাশ্যেই ঘোষণা করে চলেছেন। প্রচারণা, এক্ষেত্রে এমনভাবে চলছে যেন মৌলবাদ মানেই ইসলামী মৌলবাদ; যেন ইসলাম মানেই মৌলবাদ, আর, মৌলবাদ মানেই ইসলাম। আসলেই কি তাই? ইতিহাস কিন্তু একেবারেই তা বলে না।

'মৌলবাদ' শব্দটাকে ইংরেজিতে বলে fundamentalism। *এনসাই-ক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা ২০০২ ডিলাক্স এডিশান সিডি-রম* এবং *মাইক্রোসফট এনকার্টা এনসাইকোপিডিয়া ২০০২ সিডি-রম* বলছে, fundamentalism নামক পদার্থটার জন্ম ১৯-শতকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের খ্রিস্টীয় পুনরুজ্জীবন-বাদী প্রোটেস্ট্যান্ট ধারার মধ্যে। বাইবেলের সত্যকে অকাট্য মনে করা এই ধারার বৈশিষ্ট্য। এঁরা বৈজ্ঞানিক বিশ্ববীক্ষা ও বিবর্তনবিদ্যার ঘোর বিরোধী। ২০-শতকে মার্কিন ধর্মীয় ও সেক্যুলার জীবনে 'আধুনিক' প্রবণতাসমূহের বিরোধিতা হিসেবে এই মৌলবাদের প্রসার। ২০-শতকের শেষ ভাগে অসংখ্য চার্চ-সংস্থায়, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে এবং বিশেষ বিশেষ সংগঠনের মধ্য দিয়ে এর প্রতিনিধিত্ব ঘটে। খোদ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেই অসংখ্য খ্রিস্টান ধর্মগোষ্ঠী মৌলবাদের নানা রূপের চর্চা অব্যাহত রেখেছে। এঁদের মধ্যে কোনো কোনো গ্রুপ সশস্ত্রও বটে।

খ্রিষ্টীয় ধর্মতত্ত্ব থেকে পাওয়া 'মৌলবাদ' কথাটা পরে আস্তে আস্তে সকল ধর্মমতের ক্ষেত্রেই সেই ধর্মমতের গোঁড়া ও আদি রীতি-নীতি-শিক্ষার অন্ধ অনুসারীদেরকে বোঝানোর জন্য ব্যবহার করা হতে থাকে। পশ্চিমা প্রচারণা-মাধ্যমের তেলেস্মাতিতে এখন সারা বিশ্বের মানুষকে এমন ধারণা দেয়া হচ্ছে যে, মুসলমান মানেই মৌলবাদী এবং মৌলবাদী মানেই মুসলমান, ইসলাম ধর্মটিই মৌলবাদী। প্রকৃতপক্ষে, ইসলামের সাম্প্রতিক উত্থানকে রাজনৈতিক ঘটনা হিসেবে বিবেচনা না-করে শুধু সমাজ-সময়-ঊর্দ্ধ অনড় ধর্মশাস্ত্র দিয়ে

বিচার করাটা পরিস্থিতিকে বুঝতে সাহায্য করে না। ওয়াশিংটন ডি.সি.র জর্জটাউন-বিশ্ববিদ্যালয়ের ধর্ম ও আন্তর্জাতিক বিষয়াবলীর অধ্যাপক এবং মুসলমান-খ্রিস্টান ভাববিনিময়-কেন্দ্রের পরিচালক জন এল. এস্পোসিটো-ও তাই মনে করেন। *The Islamic Threat: Myth or Reality?* গ্রন্থের এই লেখক পরিষ্কার বলছেন যে,

> 'মৌলবাদ' কথাটা, যার জন্ম খ্রিস্টান-ধর্মমতে, ইসলাম ও মুসলিম দেশ-গুলোকে বর্ণনা করার বেলায় বিভ্রান্তিকর হতে পারে। সৌদি আরবের রক্ষণশীল রাজতন্ত্র, লিবিয়ার বিপ্লবী সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র, এবং মোল্লা-চালিত ইরাণ এই সবাইকেই বলা হচ্ছে 'মৌলবাদী', কিন্তু শব্দটা দেশ তিনটার পার্থক্যকে ব্যাখ্যা করতে পারে না। লিবিয়া ও ইরাণ, উদাহরণ-স্বরূপ, পশ্চিমবিরোধী ধ্যানধারণাকে বিশ্বাস হিসেবে গ্রহণ করেছে; আবার সৌদি আরব মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ঘনিষ্ঠ মিত্র। রাজনীতিতে ইস-লামের ভূমিকা বোঝানোর জন্য 'রাজনৈতিক ইসলাম' বা 'ইসলামতন্ত্র' কথাগুলো আরো কাজের। [Esposito, 2002]

'মৌলবাদী' নামক গালিটির ব্যবহার নিয়েও রাজনীতি চলে। মুসলিম দেশগুলোর মধ্যে সৌদি আরবকে কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র মৌলবাদী বলে না, মধ্যপন্থী বা মডারেট বলে [Husseini, 1995], কেননা সৌদি আরব গুরুত্বপূর্ণ মার্কিন-মিত্র। কিন্তু সৌদি আরবের নৈতিক ও আর্থিক মদদপুষ্ট তালিবানরা মৌলবাদী, কারণ তাঁরা মার্কিন তেল-সরবরাহ-পরিকল্পনায় সাড়া দেয় নি।

মুসলমান মানেই সহিংস

মুসলমানদের সম্পর্কে ১৯৯৮ সালের বার্ষিক পর্যালোচনা-প্রতিবেদন লিখতে যেয়ে ব্রিটানিকা-র পণ্ডিতরা শুরুই করছেন মারামারি দিয়ে [Britannica, 2002-a]। কেননা, একদিকে পশ্চিমা সমাজের গভীর ও প্রখর খ্রিস্টীয় মনো -গাঠনিক বৈশিষ্ট্য এবং অন্যদিকে তাঁদের প্রচারণা-মাধ্যমের মুসলমান-বিরোধী ক্রুসেডের কারণে পশ্চিমা জগতে এখন মুসলমান বলতে এক প্রকার

মারাত্মক সহিংস প্রাণীকে বোঝায় যারা শান্তি, শুভ, কল্যাণ ও গণতন্ত্রকে ঘৃণা করে। তাই দুনিয়া-বিখ্যাত ঐ পণ্ডিতগণ তাঁদের প্রতিবেদনের শুরুতেই বলেন, সাম্প্রতিক বছরগুলোতে মুসলমানদের যে-বৈশিষ্ট্যটা খুবই প্রবল ছিল এবং যেটা ১৯৯৭ সালেও বজায় ছিল সেটা হলো সহিংসতা, আক্রমণ, হামলা। পশ্চিমা দুনিয়ায় এই হয় মুসলানের সামাজিক পরিচয়। এই পরিচয় আপনাআপনি পয়দা হয় নি, এটাকে তৈয়ার করা হয়েছে। তৈয়ার করেছে পশ্চিমা শাসকশ্রেণীর প্রচারণা-মাধ্যম, এবং অন্যান্য রাষ্ট্রীয় মতাদর্শিক হাতিয়ারসমূহ (যেমন বিশ্ববিদ্যালয় বা ব্রিটানিকা-বিশ্বকোষ)।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সমাজে মুসলমানরা বৃহৎ একটি ধর্মীয় গোষ্ঠী। সংখ্যায় ৫৫ লক্ষ; জনসংখ্যার ২ শতাংশ। ইহুদিদের সমান প্রায়। লস এঞ্জেল্‌স্‌ টাইম্‌স্‌ (১৭ই ডিসেম্বর ১৯৯৪) এর পুরানা এক হিসাবমতে, চলতি শতকের গোড়ার দিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সবচে বড়ো অ-খ্রিস্টান ধর্ম হবে ইসলাম [Husseini, 1995]। অথচ, *ইন্সটিটিউট অফ পাবলিক অ্যাকিউরেসি*-র যোগাযোগ-পরিচালক জনাব স্যাম হুসেইনির কাছ থেকে জানা যাচ্ছে, প্রতিদিনের জীবনের যে-মিডিয়া-বিবরণী তাতে মুসলমানদের উল্লেখ খুবই বিরল। রমজানের মতো ধর্মীয় ঘটনা আসে-যায়, মিডিয়া খুব কমই লক্ষ করে। মুসলমানরা প্রচারণামাধ্যমের ‘সংবাদ’-এ জায়গা পান শুধুমাত্র যখন তাঁদের সাথে কোনো-না-কোনো ধরনের সহিংসতার সম্পর্ক থাকে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মুসলমানদের প্রতি যতোটা মনোযোগ দেয়া হয় তার বেশির ভাগটাই পায় আফ্রিকান-আমেরিকানদের সংগঠন লুই ফারা খানের ‘নেশান অফ ইসলাম’। এঁরা বর্ণবাদী, ইহুদি-বিদ্বেষী, গোঁড়া। এঁরা সাদাদের তুলনায় কালোদের নরগোষ্ঠীগত বা বর্ণগত শ্রেষ্ঠত্বে বিশ্বাসী। এঁরা মনে করেন, আল্লাহ্‌পাক এঁদেরকে দায়িত্ব দিয়েছেন এই পৃথিবীকে নেতৃত্ব দেওয়ার। এঁরা এঁদের আদি নেতা, ১৮৭৭ সালে মক্কায় জন্মগ্রহণকারী ও ১৯৩০ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আগমনকারী, ওয়ালি ফারাদ বা ডব্লিউ. ডি. ফার্দকে আল্লাহ্‌র ‘অবতার’ বা নবী মনে করেন [Britannica, 2002-c]। এঁদের অনুসারী প্রায় ১০ হাজার, অর্থাৎ ২০ লক্ষ আফ্রিকান-আমেরিকানের অতি ক্ষুদ্র এক অংশ। মুসলমানদের একটা অতি ক্ষুদ্র অংশের এহেন ‘ধর্মান্ধ’

পরিচয়কে সাধারণভাবে মুসলমানদের পরিচয় হিসেবে সামনে তুলে ধরার উদ্দেশ্যেই পশ্চিমা প্রচারণামাধ্যম নেশান অফ ইসলামকে পছন্দ করে।

পশ্চিমের প্রচারণামাধ্যম এমনভাবে মুসলমানদের সামাজিক পরিচয় বানায় যেন রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে সন্ত্রাসের আশ্রয় নেয়াটা একমাত্র তাদেরই বৈশিষ্ট্য। সহজেই পশ্চিমা প্রচারণামাধ্যমগুলো ভুলে যায় যে, মুসলমানদের বিভিন্ন গোষ্ঠীর রাজনৈতিক সন্ত্রাস পরিচালনা শুরু করার বহু আগে থেকে পৃথিবীতে রাজনৈতিক সন্ত্রাসের ব্যবহার অত্যন্ত ব্যাপকভাবেই ছিল। উদাহরণ হিসাবে প্যালেস্টাইনে সারা দুনিয়ার ইহুদিদের স্বতন্ত্র রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে ‘স্টার্ণ গ্যাং’ ও ‘ইরগান’, এবং দক্ষিণ আফ্রিকায় বর্ণবাদবিরোধী দীর্ঘ লড়াইয়ে ‘আফিকান ন্যাশনাল কংগ্রেস’ বা এএনসি’র যেভাবে রাজনৈতিক সন্ত্রাস ব্যবহার করেছে এখানে তার সামান্য বিবরণ দেয়া যেতে পারে।

বোস্টন বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্কবিদ্যার প্রফেসর ড. ভজটেক মাস্ত্নি জানাচ্ছেন [Mastny, 2002]: পৃথিবীতে রাজনৈতিক অর্থে সন্ত্রাসী তৎপরতার শুরুই ইহুদিদের হাতে — খ্রিস্টীয় ১ম শতকে — যখন জিলটরা (একটা ইহুদি ধর্মীয় গোষ্ঠী) রোমানগণ কর্তৃক বর্তমানে যেটাকে ইসরায়েল বলা হয় সেটার দখলের বিরুদ্ধে লড়াই করছিল। সেটা ছিল শুরু। তারপর ব্রিটিশদের কাছ থেকে ছলে-বলে-কৌশলে প্যালেস্টাইন দখল করে নিয়ে ইহুদিদের রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে গড়ে ওঠে উচ্চ মাত্রায় সশস্ত্র ‘আত্ম-প্রতিরক্ষা’ বা ‘হাগানাহ্’, ‘ইসরাইলের স্বাধীনতা-যোদ্ধা’ বা ‘লোহামে হেরাত ইসরাইল’ (সংক্ষেপে ‘স্টার্ন গ্যাং’ বলে অধিকতর পরিচিত) এবং ‘জাতীয় সামরিক সংগঠন’ বা ‘ইরগান জ্ভায় লিউমি’র মতো চরমপন্থী সন্ত্রাসবাদী প্রতিষ্ঠান। ১৯৪৪ সালে ইসরাইলের ভবিষ্যৎ-প্রধানমন্ত্রী মেনাহেম বেগিন প্রতিষ্ঠা করেন ‘ইরগান’ গেরিলাবাহিনী। ইসরাইলের আরেক ভবিষ্যৎ-প্রধান -মন্ত্রী আইজাক শামিরও এই ইরগান-এর সদস্য ছিলেন। ব্রিটিশরা তাঁকে দু-বার গ্রেপ্তার করেছিল। ১৯৪০ এর দশকে আরব ও ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে এই দলগুলোর তৎপরতা ছিল বলার মতো। বহু ব্রিটিশের প্রাণহানি ঘটে সেসব ঘটনায়। একটা দৃষ্টান্ত: ১৯৪৬ সালে কিং ডেভিড হোটেলে ব্রিটিশ সরকারের অফিসে মারাত্মক বোমাহামলায় মারা যায় ১০০ জনেরও বেশি লোক।

‘হাগানাহ্’র দুই সদস্য খুন করেছিল মিসরের কায়রোয় আবাসিক ব্রিটিশ মন্ত্রী লর্ড ময়েন-কে।

অন্য দিকে, ইন্ডিয়ানা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞানের প্রফেসর ও আন্তর্জা-তিক কর্মসূচির ডিন ড. ও’মিয়ারা এবং ঐ একই বিশ্ববিদ্যালয়ের বৈশ্বিক-পরিবর্তন-অধ্যয়ন-কেন্দ্রের পরিচালক ড. উইনচেস্টার জানাচ্ছেন [O’Meara and Winchester, 2002]: দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণবাদবিরোধী আন্দোলনের নেতা নেলসন ম্যান্ডেলার বিচার শুরু হয় ১৯৬৪ সালে এএনসি’র সামরিক শাখা ‘জাতির বর্শা’র সন্ত্রাসবাদী নেতাদের সাথে। ১৯৬১ সালে প্রতিষ্ঠিত এই সংগঠনের প্রধানত স্যাবোটাজ-কর্মকাণ্ডকে তাঁরা নিজেরা বলতেন “যথাযথভাবে নিয়ন্ত্রিত সহিংসতা”। এই সংগঠনটি সহিংস তৎ-পরতা চালাচ্ছিল ১৯৫৭-৫৮ থেকে ১৯৬৩-৬৪ পর্যন্ত। এর পরেও বটে। তো, ১৯৬৪ এর এপ্রিল মাসে ম্যান্ডেলা যে-জবানবন্দী দেন, তাতে তিনি বলেন, যাঁরা ঐ সামরিক সংগঠনটি গড়ে তোলেন তিনি তাঁদের একজন ছিলেন এবং ১৯৬২ সালে গ্রেপ্তার হওয়ার আগ পর্যন্ত তিনি এর তৎপরতায় নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। অর্থাৎ, এএনসি’র ‘সন্ত্রাসী’ তৎপরতা এর সর্বোচ্চ নেতৃত্বের পর্যায় থেকেই পরিচালিত হতো। মজার ব্যাপার হলো, ম্যান্ডেলাদের এই সংগঠনের কর্মকর্তাদের পদবী-নামগুলো তাঁরা নিয়েছিলেন উপরোক্ত ইহুদি ‘সন্ত্রাসবাদী’ সংগঠন ‘ইরগান’-এর সংগঠন-পরিচালনা-পদ্ধতির কাছ থেকে। কে কাকে সন্ত্রাস শেখায়! কে কাকে ইতিহাস শেখায়! আর পাঠক, সেই সাথে মনে রাখুন, মেনাহেম বেগিন এবং নেলসন ম্যান্ডেলা উভয়ই পরবর্তী কালে, যথাক্রমে ১৯৭৮ ও ১৯৯৩ সালে, শান্তির জন্য নোবেল-পুরস্কার পেয়েছিলেন। (আরাফাতের জন্যেও হয়ত আমরা একটা নোবেল-শান্তি-পুরস্কার ভবিষ্যতে আশা করতে পারি, যদি তিনি তত দিন বেঁচে থাকেন!)

এইসব তথ্য আমরা পশ্চিমা প্রচারণামাধ্যমে পাব না। সেখানে পাব শুধু এই কথা যে, পৃথিবীতে সহিংস/সন্ত্রাসী মানেই মুসলমান কেউ, যেন আর কোনো ধর্মাবলম্বী রাজনৈতিক গোষ্ঠী কোনো দিন কোথাও সন্ত্রাসের আশ্রয় নেয় নি। এ ক্ষেত্রে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পরিস্থিতির বিবরণ মেলে স্যাম হুসেইনির কথায়: ‘গোঁড়া মুসলমান সন্ত্রাসবাদীরা’ কীভাবে ‘ইসলামী মৌল-বাদী সহিংসতা’র ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে ‘ইসলামী হুমকি’ সৃষ্টি করছে সেরকম সব

রিপোর্টে পশ্চিমা প্রচারণামাধ্যমগুলো এমনভাবে ঠাসা থাকে যে, গড়পড়তা মার্কিনীদের বিশ্বাস করা স্বাভাবিক, ইসলামের মৌলচেতনার মধ্যেই আছে ধ্বংসের প্রশিক্ষণ; এই রকম বিশ্বাসের জন্যে তাদেরকে হয়ত দোষও দেয়া যায় না। পরিস্থিতি এতই খারাপ যে, আরো ৬/৭ বছর আগে ১৯৯৫ সালের একটি জনমত-যাচাইয়ে [L.A. Times, May 6, 1995] ৪৫ শতাংশ মার্কিনী বলেছিলেন যে, "মুসলমানদের মধ্যে ধর্মান্ধ হওয়ার প্রবণতা আছে" [Husseini, 1995]।

২০০১ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের টুইন-টাওয়ার ও পেণ্টাগনে হামলার পর মুসলমানদের এই সহিংস/সন্ত্রাসী সামাজিক পরিচয়ের আরো অবনতি ঘটেছে। গত ১৬ সেপ্টেম্বরে সিএনএন সাক্ষাৎকার নেয় মার্কিন একজন সামরিক বিশেষজ্ঞ জনাব উইলিয়াম টেইলরের। ১১ তারিখের হামলা সম্পর্কে তিনি বলছিলেন:

> হামলা কারা করেছে সে ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট কোনো প্রমাণ নাই। কিন্তু আমার মনে হয়, জঙ্গী মুসলমানরা এতে জড়িত থাকার বিরাট সম্ভাবনা আছে। [Quraishy, 2001] (অনুবাদ আমার — স.র.ন.)

দেখুন, "কোনো সুনির্দিষ্ট প্রমাণ নেই", তবু "আমার মনে হয়" মার্কা বিশেষজ্ঞ-জ্ঞান জাহির করা হচ্ছে যে, "মুসলমানরা এতে জড়িত থাকার বিরাট সম্ভাবনা আছে"!!! কেমন অবলীলায় এই বিশেষজ্ঞ-ব্যক্তি-জনাব বিষোদগার করছেন মুসলমানদের সম্পর্কে। আসলে ধরেই নেয়া হয় যে, মুসলমানরা তাঁদের ধর্মকে এগিয়ে নেয়ার জন্য 'সন্ত্রাস' এর আশ্রয় নেয়। মিডিয়া কোনো প্রকার পরীক্ষানীরিক্ষা না-করেই এই 'বিশ্বাস' বা 'ধারণা'র ওপর দাঁড়িয়ে প্রচারণা চালায়, বিদ্যমান 'বিশ্বাস' বা 'ধারণা'কেই আরো পোক্ত করে। হাজার-লক্ষ মুসলমান যাঁরা খোদ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেরই নানারকম ব্যবসা-বাণিজ্য-চাকরিতে নিয়োজিত থেকে সেদেশের অর্থনীতিতে অবদান রাখছে সে-ব্যাপারটা মিডিয়ার নজরেই আসে না। এরকম শান্তিকামী লাখো মানুষের প্রতিদিনের জীবনযুদ্ধ মিডিয়ার উপজীব্যই হয় না। টিভি-ফিল্মে কোনো আরব পরিবারের ছবি কখনো দেখানো হয় না কিংবা যাঁরা আর দশ

জনের মতো স্বাভাবিক আচরণ করেন তেমন কোনো আরবকে টিভির সিনেমায় কখনো দেখা যায় না — বলেছেন একজন বিশেষজ্ঞ জ্যাক শাহীন [Quraishy, 2001]।

পশ্চিমা প্রচারণামাধ্যমে মুসলমানরাই কেন প্রধান টার্গেট?

কারো কারো মনে এরকম ধারণা আসতে পারে যে, মুসলমানরা মুসলমান বলেই, তাদের বিরুদ্ধে পশ্চিমা প্রচারণামাধ্যমের এই প্রচারণা। এরকম ধারণার পেছনে এক ধরনের সত্যতা ছোঁয়া আছে বৈকি, কিন্তু এই ধারণা পুরোপুরি ঠিক নয়। আসলে ইসলামের বিরুদ্ধে পশ্চিমের একটা সামরিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক ক্রুসেড বরাবরই অব্যাহত আছে। পশ্চিমের উপনিবেশ ইসলামকে পশ্চিমা ছাঁচের "আধুনিক" বানাতে তেমন একটা সফল হয় নি। এর মানে হলো, তথাকথিত ইসলামী বিশ্ব পশ্চিমের চশমা দিয়ে জগতবিচার করে না। তাদের সমাজ কমই পশ্চিমায়িত হয়েছে যতটা হয়েছে ভারতবর্ষ। কাজেই, ইসলামকে ইসলাম বলেই তার বিরুদ্ধে বিষোদগারের একটা প্রবণতা পশ্চিমা মিডিয়ার আছে বৈকি! কিন্তু সেটাই সব নয়। পশ্চিমা মিডিয়া হলো পশ্চিমা বড়লোক শাসক শ্রেণীর মিডিয়া। এ শুধু ইসলাম বা মুসলমানের মুখকেই বাঁকাভাবে দেখায় না অপরাপর জাতিধর্মভাষাসংস্কৃতির মানুষকেও দেখায় বিকৃত 'অপর' হিসাবে। "'অপর'কে দানবে পরিণত করাটা কোনো প্রকার শোভন রাজনীতির ভিত্তি হতে পারে না" — এডওয়ার্ড সাইদের এই বিচার পশ্চিমের বিবেক-বিবেচনাবোধে কোনো সাড়া তৈরি করে না। তারা এশীয়, কালো, আফ্রিকীয়, ল্যাটিনো প্রভৃতি মানুষদেরকে গৎবাঁধা ছাঁচে পরিবেশন করে। কালো মানুষ মানেই সামাজিক অপরাধের সাথে যুক্ত হবার প্রবণতাসম্পন্ন, কিংবা স্থুল বুদ্ধির লোক, কিংবা হাস্যকর কোনো চরিত্র; অথবা নারী মানেই কোমল, সুন্দর, নির্বিবাদ, ভোগযোগ্য, যৌনদ্রব্য — এই প্রকার আরো নানান ধারণা বা 'সংখ্যালঘু'র সামাজিক ইমেজ যে পশ্চিমের প্রচারণামাধ্যম প্রতিদিন নির্মাণ করে চলেছে সেটা পশ্চিমের গবেষকদের অসংখ্য গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে।

মুসলমানদের বেলায় পশ্চিমের বিশেষ মনোযোগের আরেকটা কারণ হলো তেল। মধ্যপ্রাচ্য ও মধ্য এশিয়ার তেলগ্যাস সম্পদ এই অঞ্চলকে

পশ্চিমের কাছে বিশেষভাবে গুরুত্ববহ করে তুলেছে। ফলে মিডিয়াতে মুসলমানদের সম্পর্কে বিশেষ ইমেজ তুলে ধরা গেলে তাদের বিরুদ্ধে সম্ভাব্য আক্রমণের পক্ষে প্রচ্ছন্ন একটা জনমত সবসময়ের জন্যে চাঙ্গা রাখা যায়।

আরো একটা কারণও শনাক্ত করা যায় পশ্চিমের মুসলমান-বিদ্বেষের পেছনে। নোম চমস্কি ও এডওয়ার্ড এস হারম্যান [Herman and Chomsky, 1994] দেখিয়েছেন, মার্কিন মিডিয়ার জন্য সবসময় একটা জাতীয় শত্রু দরকার পড়ে। এই শত্রুর ছায়ার বিরুদ্ধে সদাসর্বদা যুদ্ধ বজায় রাখা তাদের মতাদর্শিক সিস্টেমের অনিবার্য কৌশল। এইভাবে, কমিউনিজম্-বিরোধিতা একসময় তাদের জাতীয় ধর্মে পরিণত হয়েছিল। সেই শত্রুর বিরুদ্ধে 'সভ্যতা ও গণতন্ত্র রক্ষার' লড়াইয়ের দোহাই দিয়ে এতদিন পশ্চিম সারা বিশ্বে তার আধিপত্য ও বাণিজ্য বিস্তারের কাজ চালিয়ে গেছে, আর এখন ১১ই সেপ্টেম্বরের পরে সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে তো যুদ্ধই ঘোষণা করেছে সবচে বড়ো রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসবাদী দেশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে এই যুদ্ধ আসলে ইসলামের বিরুদ্ধে সরাসরি যুদ্ধ। মানে মধ্যপ্রাচ্য ও মধ্যএশীয় অঞ্চলে সামরিক-ব্যবসায়িক-তৈলাক্ত আধিপত্য বিস্তারের যুদ্ধ। এই যুদ্ধে তাই সন্ত্রাসবাদের নাম ভাঙিয়ে এই অঞ্চলের মুসলমান-প্রধান দেশগুলোকে (একের পর এক ইরাক, লিবিয়া, আফগানিস্তান, ইরান) 'সাইজ' করার জন্য সহজেই টার্গেট করা যায়। সেই জন্য এখনকার জাতীয় শত্রু হলো সন্ত্রাসবাদ (মানে ইসলামী দুনিয়ার দেশগুলো)। এটাও একটা কারণ যা দিয়ে আপনি পশ্চিমের প্রচারণামাধ্যমে মুসলমানদের সামাজিক পরিচয় তৈয়ার করার উদ্দেশ্যকে অনেকখানি ব্যাখ্যা করতে পারেন।

বাংলাদেশের 'সংখ্যালঘু'র প্রশ্ন

পৃথিবীর সব দেশের বেলায়ই কিন্তু অধিপতি শাসক ও অবনত গোলাম শ্রেণীর মধ্যেকার 'সংখ্যালঘু'র সামাজিক পরিচয় নির্মাণ সংক্রান্ত সামাজিক-অর্থনৈতিক হিসাবনিকাশগুলো কমবেশি একই রকম। বাংলাদেশের হিন্দু 'সংখ্যালঘু'দের সম্পর্কেও আমাদের সমাজে (এবং প্রচ্ছন্নভাবে হলেও মিডিয়াতে), এই ধারণা প্রচলিত আছে যে তারা যথেষ্ট দেশপ্রেমিক নয়; তারা আসলে 'ওপারের' প্রতিই বেশি টান বোধ করে; তারা আসলে ভারতকেই তাদের দেশ

মনে করে; এদেশের ‘সংখ্যালঘু’দের ওপর আসলে কোনো নিপীড়ণ নাই বললেই চলে; তারা এদেশে যথেষ্ট ভালো আছে; তারা আসলে এতো ভালো থেকেও ভারতে টাকা জমায়, দেশে পাকা বাড়িঘর বানায় না, সবসময় এক পা ওপারের দিকে তুলেই রাখে; কিংবা হিন্দুরা কৃপণ, ওদের দেবদেবীদের ধারণা হাস্যকর, এমন কি ওরা কতলযোগ্য ‘কাফের’ — এরকম নানান ধ্যানধারণা আমাদের সমাজের মানুষদের মধ্যে নানা মাত্রায় কমবেশি আছে বলে পর্যবেক্ষণ থেকে মনে করা যায়।

বঙ্কিম রস উৎপন্ন হয় মস্তিষ্কে, যখন দেখি, ইহুদিদের বিরুদ্ধে কী কী ষড়যন্ত্র হচ্ছে তার একটা তালিকা প্রদান করেছেন প্যাট রবার্টসন তাঁর *The New World Order* বইতে। এই বই আর তার ইহুদিবিরোধী ষড়যন্ত্র-তত্ত¡ পরিবেশনের দিকটা অধিপতি ধারার বা প্রধান ধারার প্রচারণামাধ্যমে গুরুত্ব পেল ঠিকই কিন্তু তাদের কাছে গুরুত্ব পেল না এই তথ্য যে, ঐ বইতে রবার্ট-সন সরকারী পদসমূহ থেকে মুসলমান ও হিন্দুদেরকে বাদ দেয়ার জন্য সরাসরি আহবান জানিয়েছেন [Robertson, 1995]। ভারতবর্ষের নিরন্তর গলাগলি-মারামারি করা হিন্দু-মুসলমান উভয়ই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসক-শ্রেণীর মধ্য-কার ইহুদিদের চোখে আপত্তিকর ‘সংখ্যালঘু’ বলে চিহ্নিত হতে থাকে। কি পরিহাস!

শুরুর দিকেই বলেছিলাম, আমাদের দেশের ‘সংখ্যাগুরু’ মুসলমানদের মনের মধ্যে ‘সংখ্যালঘু’র মনঃস্তাত্তি¡ক গূঢ়ৈষণার বেদনা-সঞ্চার করা এই প্রবন্ধের অন্যতম দিক। সেই লক্ষ্যেই বলতে গেলে, মূলত বাংলাদেশের হিন্দু-দের প্রতি মুসলমান-প্রধান সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে প্রবন্ধের এখানে-ওখানে এটা-সেটা বলেছি। ফলে, অসতর্ক পাঠকের মনে এই প্রকার সরল হিসাব কাজ করতে পারে যে, যেসব কায়দায় পশ্চিমা খ্রিস্টান সমাজ ‘সংখ্যা-লঘু’ মুসলমানদের সামাজিক পরিচয় তৈয়ার করে, বাংলাদেশের মুসলমান সমাজও বুঝি ঠিক সেই সেই কায়দায় ‘সংখ্যালঘু’ হিন্দুদের সামাজিক পরিচয় বানিয়ে তোলে। হিসাবটা এরকম সরল করলে চলবে না মোটেও। আসলে যে-দুই পরিস্থিতির পরোক্ষ তুলনা আমরা ঐ বাক্যে করেছিলাম সেই দুই পরিস্থিতির মধ্যে বিপুল অমিল রয়েছে; বিশেষত ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটের অমিল। পশ্চিমে খ্রিস্টানদের সাথে মুসলমানদের সম্পর্কের ইতিহাস, আর

বাংলাদেশের মুসলমানদের সাথে হিন্দুদের সম্পর্কের ইতিহাসে আকাশ-পাতাল তফাত আছে। দুনিয়াতে মানুষ নামক প্রাণীর ধাতই এমন যে, দেশ-কাল-কালচারের ভেদ বিচার না-করে (লিঙ্গগত বা শ্রেণীগত; ভেদ বিচারের প্রশ্নও এর মধ্যে পড়ে) কোনো সমাজের একটা হিসাবকে ফর্মুলা হিসাবে আর কোথাও সরলভাবে খাটাতে গেলেই বিপত্তি শুরু হয়। আবার এ-কথাও সত্য যে, একটা সমাজকে আমরা কষ্ট করে পাঠ করি অন্য কোনো সমাজকে বোঝার বেলায় পূর্বপাঠজনিত শিক্ষাকে কাজে লাগাব বলেই, তাই না? পূর্বপাঠকে কাজে লাগানোর বেলায় দেশ-কাল-কালচারের ভেদ বিচার করার বিষয়টি সতর্কভাবে বিবেচনায় নিতে হবে — ইহাই কহিতব্য। এক্ষেত্রে যত বেশি সতর্কতা তত বেশি উপকার। পশ্চিমা সমাজ, বিশেষ করে প্রচারণা-মাধ্যম, যেভাবে 'নিজের' (মানে শ্বেতাঙ্গ খ্রিস্টান) বিপরীতে 'অপর'কে (মানে কৃষ্ণাঙ্গ, ল্যাটিনো/হিস্পানি, আদিবাসী মার্কিনী, মুসলমান) নির্মাণ করে তাতে কতকগুলো ঐতিহাসিক-সাংস্কৃতিক-ধর্মীয় ফ্যাক্টর জারি থাকে ঠিকই কিন্তু তাই বলে আমরা যেন মোদ্দা জায়গাটা থেকে পা হড়কে না-যাই। সেই জায়গাটা হলো, এক কথায়, সমাজের অধিপতি অংশ কর্তৃক নিপীড়িত অংশকে 'অপর' বানানো। বাংলাদেশের সমাজে (প্রগতিশীল-প্রতিক্রিয়াশীল অংশ নির্বিশেষে) 'সংখ্যালঘু' হিন্দুরা যেভাবে-যেভাবে 'অপর'-এ পরিণত হয়েছে তা নিয়ে কাজ করতে চাইলে আমাদেরকে পশ্চিমা সমাজের 'অপরায়ন'-প্রক্রিয়ার কথাও মাথায় রাখতে হয়।

প্রশ্নটা 'পশ্চিম বনাম অপশ্চিম'-এর নয়

পশ্চিমকে বোঝাতে এই প্রবন্ধে যে মাঝেমধ্যে 'সভ্য', 'আধুনিক', 'অগ্রসর' ইত্যাদি বিশেষণ তীর্যকভাবে ব্যবহার করেছি সেটা পশ্চিমের সমাজকে কটাক্ষ করার জন্যই কেবল, তাচ্ছিল্য করার জন্য নয়। উদ্দেশ্য বা প্রস্তাব — এই সবের বেলায় — এইটা না যে, অপশ্চিম পশ্চিমের চেয়ে বেশি উন্নত, কিংবা পশ্চিম আগাগোড়া প্রত্যাখানযোগ্য বা অগ্রহণযোগ্য। উপনিবেশের জাহাজে চড়ে 'আধুনিকতা'র বিশ্বদখলের অভিযানের কথা আমরা কিন্তু সদাসর্বদা মনে রাখি। সেই জন্যই বুঝতে পারি, পশ্চিমই মানব-মুক্তির কেবলা বলে যে-কথা সারা দুনিয়ায় রটে আছে তাহা ঠিক নহে। পশ্চিমও, অনেক দিক থেকেই,

অপশ্চিমের কাছে হাত পাততে পারে (আর অপশ্চিম তো পশ্চিমের কাছে হাত পেতেই আছে)। মোট কথা, পশ্চিম-অপশ্চিমের মধ্যে কে 'উন্নত' এবং কে 'অনুন্নত' সেটা আমাদের ঝামেলা না। প্রশ্নটা মানুষের মুক্তির বা স্বাধীন বিকাশের — সব দেশের মানুষের। বিকাশের এই প্রশ্নটা আসলে লড়াইয়ের প্রশ্ন: মানুষের 'খাঁচা'র সীমাকে প্রসারিত করার পথে যত বাধা আছে তার সকল রূপ বা ধরনের বিরুদ্ধে 'বন্দী' মানুষের লড়াই। অরিজিনাল রেফারেন্স চাই অন্যান্য 'জন্য'র পাশাপাশি 'সংখ্যালঘু' নামে পরিচিত পশ্চিমের নিপী-ড়িত জনগোষ্ঠীর লড়াইয়ের প্রশ্নগুলোকে চিনে নেওয়ার জন্যেও এই প্রবন্ধের অবতারণা। প্রশ্নগুলোর মধ্যে (সর্বপ্রধান না-হলেও অন্তত) অন্য-তম প্রধান প্রশ্ন হলো, উপনিবেশ-'আধুনিকতা'-সাম্রাজ্যবাদ-'বিশ্বায়ন' এর একদা-লৌহ-অধুনা-ডিজিটাল শেকলের ধারাবাহিকতাটাকে চিনে নেয়ার প্রশ্ন। পশ্চিমের সমস্ত কিছু সোজাসাপ্টা ঢালাওভাবে খারিজ করে দেয়ার মানে সেখানকার মানুষের অর্জনগুলোকেও খারিজ করা। এই ভ্রান্তিবিলাস করতে যাঁরা ভালোবাসেন তাঁদেরকে এই প্রবন্ধের লেখক ভালোবাসেন না; কারণ তাঁরা দেখতে চান না, যাহা পশ্চিমের মানুষের অর্জন তাহা সাধারণভাবে নিখিল মানুষের লড়াইয়ের অর্জনও বটে; কেননা তথাকথিত 'গোলকায়নের' বহু আগে থেকেই, এক্কেবারে আদি থেকেই, দুনিয়া আসলে একটা এবং সেইটা গোল এবং বিশ্ব-বৈচিত্র্য-বিকাশের মধ্য দিয়েই তার আজকের অস্তিত্ব।

বিশ্ব-ফাটানো রাষ্ট্রবিজ্ঞানী প্রফেসর স্যামুয়েল হান্টিংটনের মতো পণ্ডিতের এবং একই মনোভাবাপন্ন মিডিয়ার ইসলামবিরোধী সেন্টিমেন্টকে প্যালেস্টাইনী বংশোদ্ভূত মার্কিন নাগরিক, প্রাচ্যবাদ নামের যুগান্তকারী গ্রন্থের প্রণেতা এডওয়ার্ড সাইদ উপযুক্তই বলেছেন: "সর্বশেষ বর্ণবাদ, যা জায়েজ" [Alternative Radio, 25 April 1995]। হান্টিংটনের 'সভ্যতার সংঘাত' তত্ত¡কে সাইদ খানিকটা আদর করে 'অজ্ঞতার সংঘাত' [সাঈদ, ২০০১] নাম দিয়েছেন। তিনি বলছেন:

> পাশ্চাত্য বনাম ইসলাম ... এই মৌলিক প্যারাডাইমটি কিছুদিন আগেও তেমন জনপ্রকাশ্যে, জোরোশোরে উচ্চারিত হয়নি: ভেতরে ভেতরে ছিল

— সন্তর্পণে ও সংগোপনে: কিন্তু ১১ সেপ্টেম্বরের ঘটনার পর তা দুর্ভাগ্যজনকভাবে আলাচনার কেন্দ্রবিন্দুতে চলে এসেছে। ...

কিন্তু পাশ্চাত্য এবং ইসলাম— এ বিষয় দুটোকে কেন আলাদা করে দেখা হয়? কেন ভাবা হয় না এতে করে সংঘাত ক্রমশ বাড়বে বই কমবে না? কেন ওসামা বিন লাদেন এবং তাঁর অনুসারীদের এমন একটি সম্প্রদায় হিসেবে দেখা হয় না যেমন দেখা হয় গায়ানার রেভারেন্ড জিম জোন্স কিংবা জাপানের ওম শিনরিকিও এবং তাঁদের অনুসারীদের? ...

... চূড়ান্তভাবে 'পাশ্চাত্য' বা 'ইসলাম'— জাতীয় তকমাগুলো এবং তাদেরকে সাধারণীকরণ করা কিংবা 'আমাদের' সংস্কৃতি 'অন্যদের' থেকে উন্নততর এ ধরনের ধারণা পোষণ করা যে কতটা মূল্যহীন তা সহজেই বোঝা যায়। 'পাশ্চাত্য' বা 'ইসলাম' এ ধরনের বিভাজন সৃষ্টির মধ্য দিয়ে মানবগোষ্ঠীর মধ্যে কেবল বিভেদের দেয়ালই সৃষ্টি করা হয় না, বরং জাতিসত্তা এবং জাতীয়তার মধ্যে কেবল সীমাহীন বির্তক এবং অমোচ্য পার্থক্যই সৃষ্টি করা হয়। মরুভূমির বালিতে একটি রেখা এঁকে ক্রুসেড শুরু করা য়ায়, বলা যায় তাদের মিথ্যাকে আমরা সত্য দিয়ে প্রতিহত করছি কিন্তু তাতে মানুষের কোনো কল্যাণ হয় না: জাতিসত্তার স্বাতন্ত্র্যের সূচকগুলোকে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া যায় না।

আমাদের দরকার প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের প্রচলিত, ঔপনিবেশিক অর্থ ভেঙে ফেলা। নতুন অভিধান আমাদেরকে ইশারা দেবে: আমাদের দরকার প্রাচ্যায়ন, পাশ্চাত্যায়ন নয়। প্রাচ্যায়ন মানে ওরিয়েন্টেশান; মানে জানাশোনা, লেনদেন ও পারস্পরিক পরিচয়; পাশ্চাত্যায়ন মানে পশ্চাতে যাওয়া — সূর্যের বা অন্য কারো। এমন-কি সুর্যেরও পশ্চাতে যাওয়া মানে রাত। আর অন্য কারো পশ্চাতে যাওয়া মানে নতুন করে ঔপনিবেশিক আধুনিকতায়নের খপ্পরে পড়া — উহা আমাদেরকে সনাতন-চিরন্তন 'মানুষ' থেকে উচ্ছেদ করে; মানুষকে খণ্ডিত করে ফেলে কখনও ভুগোল, কখনও ধর্ম, কখনও ইতিহাস, কখনও অন্য কোনও মর্মে। দরকার পূর্বে যাওয়া, যেদিকে সূর্য ওঠে, নতুন দিগন্ত দেখা যায়। পশ্চিমে বরফ, রাত, অন্ধকার। পূর্বে মৃত্তিকা, আলো, উষ্ণতা। সেই

জন্যেই [সঙ্গীতকার কবীর] সুমন বলেন, “সন্ধ্যা নামার সময় হলে পশ্চিমে নয় পূবের দিকে মুখ ফিরিয়ে ভাবব আমি কোন দিকে রাত হচ্ছে ফিকে”। এটা পশ্চিম বনাম অপশ্চিমের প্রশ্ন নয় — সর্বজনীন মনুষ্যত্বের অগ্রগতির সওয়াল। প্রাচ্যায়ন, মানে মানবেতিহাসের বি-উপনিবেশিকরণ, ছাড়া ইতিহাসের গরাদ থেকে পশ্চিম বা প্রাচ্য কারোরই মুক্তি নাই। ইহা হয় এই প্রবন্ধের উপসংহার।

বইপত্রের হদিস

রায়, অরুন্ধতি [২০০১], “‘ইনফিনিট জাস্টিস’-এর বীজগণিত”, *প্রথম আলো*, ৫ই অক্টোবর ২০০১। [*দ্য গার্ডিয়ান* পত্রিকায় ২৯ সেপ্টেম্বর ২০০১ তারিখে প্রকাশিত লেখার অনুবাদ। অনুবাদ করেছেন জিকরুল ইসলাম]

সাঈদ, এডওয়ার্ড (২০০১], “অজ্ঞতার সংঘাত”, *প্রথম আলো*, ২২শে অক্টোবর ২০০১। (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের *দ্য নেশন* পত্রিকায় ২২ অক্টোবর ২০০১ প্রকাশিত “দ্য ক্ল্যাশ অফ ইগনোরেন্স” নামক প্রবন্ধের অনুবাদ।]

Bagdikian, Ben [1997]. *The Media Monopoly*. 5th Edition. Boston: Beacon Press.

Britannica [2002-a], “Islam”/”Year in Review 1998: Religion”, *Britannica 2002 Deluxe Edition CD-ROM*.

Britannica [2002-b], “Worldwide Adherents of All Religions by Six Continental Areas, Mid-1998”, *Britannica 2002 Deluxe Edition CD-ROM*.

Britannica [2002-c], “Nation of Islam”, B*ritannica 2002 Deluxe Edition CD-ROM*.

Esposito, John L. [2002], “The Rise of Islamic Fundamentalism”, *Microsoft Encarta Deluxe Encyclopedia 2002*.

FAIR [2001], “Networks Accept Government ‘Guidance’”, *Media Advisory*, 12 October, http://www.fair.org/extra/writers/husseini.html

Herman, Edward S. and Chomsky, Noam [1994]. *Manufacturing Consent: The Political Eonomy of the Mass Media*. UK: Vintage.

Huntington, Samuel [1993], “The Coming Clash of Civilizations”, *Foreign Affairs*, Summer/93; New York Times, 6/6/93.

Husseini, Sam [1995], “Islam: Fundamental misunderstanding about a growing faith”, *Extra !*, July-August 1995, http://www.fair.org/extra/9507/islam.html.

Lewis, Bernard [1990], “The Roots of Muslim Rage”, *The Atlantic*, 9/90.

Mastny, Vojtech [2002], “Terrorism”, *Microsoft Encarta Deluxe Encyclopedia 2002*.

O’Meara, Patrick and N. Brian Winchester [2002], “Nelson Rolihlahla Mandela”, *Microsoft Encarta Deluxe Encyclopedia 2002*.

Quraishy, Bashey [2001], “The stereotyped image of Islam has a become crutch on which the survival of the western cultural identity depends”, http//www.multicultural.net/newsletter/article/issue3-bashey.htm

Robertson, Pat [1995]. *Extra !*, Update 6/95, http://www.fair.org/extra/.